সুচী ঃ

সবদেশের ছেলেমেয়েরাই রূপকথা ভালবাসে—ইংলণ্ড থেকে হাওয়াই দ্বীপ অবধি। তবে আগেকার দিনে ঠাকুরমা-দিদিমার মুখে যা তারা শুনতো, আজ ছাপানো বইয়ের সাজানো অক্ষরগুলি সেই কথাই তাদের শোনায়। তেমন মিষ্টি করে আত্মীয়তার মাধুর্য মিশিয়ে শোনাতে পারে না সত্যি, তবু শোনাতে সে চায়, আর তারই সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত করে এক দেশ থেকে আরেক দেশে। এই সংগ্রহখানিও সেই আকাঙ্খার পরিপোষক।

আমার দেশের কোন রূপকথা এই বইয়ে দিইনি, বই বড় হয়ে যাবার ভয়ে। 'আমার দেশের রূপকথা' নামে আর একখানি বইয়ে এদেশী কয়েকটি রূপকথা সংগ্রহ করে দিয়েছি।

—লেখক

4774

রাক্ষসের গল্প ঃ
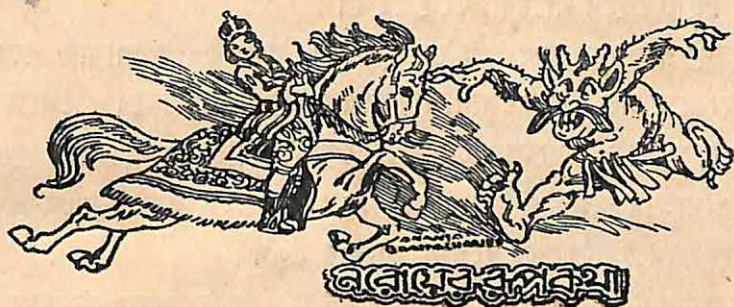
রাক্ষস ও রাজপুত্র

এক ছিল রাজা।

রাজার সাত ছেলে।

ছেলেরা বড় হয়েছে, তাদের বিয়ে দিতে হবে। রাজা ঘটক, পাঠান দেশবিদেশে। এদেশ-সেদেশ ঘুরে ঘটক ফিরে আসে, পরমা স্থন্দরী মেয়ে আর চোখে পড়ে না কোথাও, বলে—অমুক রাজার মেয়ের কপালটা উঁচু, অমুক রাজকন্যার চোখদুটো ছোট, অমুক রাজকুমারীর দাঁতগুলো ঠোঁটে ঢাকা পড়ে না, শ্রীমতীর গাল বসা, স্থনীতির থুঁৎনি বাঁকা ইত্যাদি।

রাজা বলেন—তা হলে ?

মন্ত্রী ভাবেন—তাইত !

রাজপুত্রেরা বলে—আমরাই তাহলে ক'নে দেখতে বেরোই, যাকে পছন্দ হবে তাকেই বিয়ে করে আনবো, কারুর বলার কিছু থাকবে না।

রাজা বললেন—সেই ভালো।

রাণীমা বললেন—সবাই গেলে আমি থাকবো কাকে নিয়ে, সব ছেলেকে আমি ছেড়ে দিতে পারবো না।

ছোট ছেলে মায়ের কাছে রইল।

ছ' রাজপুত্র বেরুলো ক'নে খুঁজতে। লাল জরীর পোষাক পরে, সাদা ঘোড়ার পিঠে সোনালী ঝালর ঝুলিয়ে, কোমরে তলোয়ার বেঁধে, ছ'ভাই বেরুলো। ঘোড়া ছুটলো তেপান্তরের মাঠ পার হয়ে, সাত রাজার রাজ্য ছাড়িয়ে। কত বন, কত সাগর, কত গ্রাম ঘোড়ার পায়ের নিচে দিগন্তের ধুলোয় হারিয়ে গেল।

ছ'ভাই পাশাপাশি ঘোড়া ছোটায়। পথে যখন যে রাজার রাজ্য পায় সেখানেই যায়,—মেয়ে দেখবে, পছন্দ হলে বিয়ে করবে।

আজ এ রাজার মেয়ে দেখে, কাল সে রাজার মেয়ে দেখে, পছন্দ হয় না একটীকেও।

শেষে এক রাজার ছিল ছ'মেয়ে। ছ'টি মেয়েই পরমা সুন্দরী। ছ'ভাই সেই ছ'বোনকে বিয়ে করলো। তারপর যে যার ক'নে নিয়ে ঘোড়া ছোটালো দেশের পানে।

পথে এক হিংসুটে রাক্ষসের সঙ্গে দেখা। ছ' রাজপুত্রের হাসি-খুসি দেখে তার ভারী হিংসে হোল, মন্ত্র পড়ে ধুলো ছুঁড়ে মারলো তাদের গায়—ছ' রাজপুত্র, ছ' রাজকন্যা, ছ'টি ঘোড়া যে যেখানে যেমন ছিল পাথর হয়ে গেল।

এদিকে দিনের পর দিন যায়, মাস কেটে বছরও ফুরিয়ে গেল, ছেলেরা আর ফিরে আসে না। রাজা চঞ্চল হয়ে পড়লেন, রাণীমার চোখে জল আর বাধা মানে না। ছোট রাজকুমার শেষে বললো—আমি যাব! দাদাদের খুঁজে আনবো।

সাধারণ কাপড়-জামা পরে সাদাসিধে একটি ঘোড়া নিয়ে ছোট রাজকুমার বেরিয়ে পড়লো। কোথায় যাবে, কার কাছে খোঁজ নেবে কিছুই জানে না, তবু চললো ঘোড়া ছুটিয়ে।
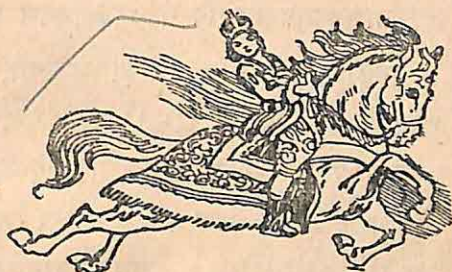
তেপান্তরের মাঠের শেষে দেখে এক শকুন বসে আছে। শকুন বললো —রাজকুমার, বুড়ো হয়ে গেছি, ভালো উড়তে পারি না, যদি কিছু খেতে দাও? পাঁচ-সাত দিন কিছু খাইনি।

রাজকুমারের কাঁধে ছিল খাবারের ঝুলি, লুচিমণ্ডা বের করে ধরে দিল শকুনের সামনে, বললো—এই নাও, খাও।

শকুন খেয়ে খুসি হোল, বললো—এই নাও আমার একটি পালক, যখনি দরকার হবে এই পালক ধরে আমায় ডাকবে, আমি আসবো।

রাজপুত্র আবার ছুটলো ঘোড়ায় চড়ে।

তেপান্তরের মাঠ পার হয়ে নদীর পাড়ে এসে রাজপুত্র থম্‌কে দাঁড়ালো। অতি ক্ষীণ স্বরে কে যেন তাকে ডাকছে—ওরে শোন্, ওরে শোন্— !

—কে? রাজকুমার ঠাহর করে দেখে—এক রুই মাছ বালির উপর পড়ে আছে। রাজকুমার তার কাছে গেল। রুই বললো— আমি তো চলতে পারি না রাজকুমার, আমায় নদীর জলে খানিকটা এগিয়ে দাও না?

রাজকুমার রুইকে ধরে নদীর জলে পৌঁছে দিল, রুই বললো

—এই নাও আমার আঁশ, যখন দরকার হবে এই আঁশ ধরে ডাকবে, আমি আসবো।

রাজকুমার আঁশটা পকেটে ফেলে আবার ঘোড়া ছোটালো।

নদীর ধার দিয়ে ঘোড়া ছুটলো, আকাশের সীমানায় এসে পড়লো এক বিরাট বনে। দুর্গম বন, গভীর বন। গাছের পাতা ছাড়িয়ে আলো এসে ঢোকে না সেই বনে। আবছা অন্ধকারে শির শির করে একটা শব্দ হয়, সারাক্ষণ সাপ আর বাঘের সাড়া পাওয়া যায় যেন চারি পাশে। তলোয়ারখানা বাগিয়ে ধরে রাজকুমার ঘোড়া ছোটায়।

সহসা পথ রুখে দাঁড়ালো এক নেকড়ে বাঘ, বললে—রাজকুমার, বড্ড খিদে পেয়েছে।

—আমি তার কি করবো ?

—তোমার ঘোড়াটা দাও, খাই।

—বাঃ! বেশ কথা, এই ঘোড়া আমাকে এতো পথ বয়ে আনলো, এতো নদ-নদী-প্রান্তর পার করলো, আর একে আমি যমের মুখে ছেড়ে দিয়ে যাব ?

—আমি ওকে মেরে খাবই রাজকুমার।

—যতক্ষণ আমার হাতে আছে তলোয়ার আর দেহে আছে প্রাণ, ততক্ষণ তোমার শক্তিতে কুলাবে না—বলে রাজকুমার তলোয়ার খুললো।

নেকড়ে বললো—তোমার ব্যবহার দেখে বড় খুসি হলাম রাজকুমার। তোমার ভালো হবে। বরাবর চলে যাও ওই পাহাড়ে। ওখানকার রাজবাড়ীতে তোমার ক'নে আছে। ওখানকার রাক্ষস তোমার ছ'ভাইকে পাষাণ করে রেখেছে।

রাজপুত্র আবার ঘোড়া ছোটালো সাত-সমুদ্দুর তেরো-নদী পার হয়ে এসে পৌঁছালো সেই পাহাড়ের মাথায়,—চমৎকার সুন্দর এক অট্টালিকার দরজায়। কোন রাজার বাড়ী ভেবে রাজপুত্র তার ভিতরে ঢুকে পড়লো। ফটক পার হতেই এক রাজকন্যার সঙ্গে দেখা, বললো—তুমি কে? কোত্থেকে আসছ? এ এক রাক্ষসের বাড়ী, পালাও—পালাও—

রাজপুত্র বললো—না, আমি পালাবো না, আমি লড়বো।

—কার সঙ্গে তুমি লড়বে, ও আমার বাবাকে মেরেছে, হাজার হাজার সৈন্য মেরেছে, তুমি একা পারবে কেন ওর সঙ্গে? তালোয়ারের ঘায়েও সে মরবে না, মুণ্ডু কেটে ফেললেও সে বেঁচে থাকবে, ওর ফুস্‌ফুস্ আর রক্তের থলি ওর বুকের মধ্যে থাকে না।

—কিন্তু আমি তোমাকে না নিয়ে ফিরবো না।

রাজকন্যা বললো—বেশ, তাহলে তোমাকে লুকিয়ে রাখি খাটের নিচে, খবরদার টুঁ শব্দটি করো না।

রাজপুত্র খাটের নিচে লুকিয়ে থাকে। সন্ধ্যা-বেলা রাক্ষস ঘরে ফেরে, বলে—

হাঁউ মাউ খাঁউ
মানুষের গন্ধ পাঁউ···

রাজকন্যা বললে—মানুষের গন্ধ আর কোথায় পাবে, আমি আছি আমাকেই খাও।

রাক্ষস হাসে, তার পর খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়ে। রাজকন্যা রাক্ষসের কাছে বসে মাথার পাকা চুল তোলে। পাকা চুল বাছতে

বাছতে কোন-এক সময় চুলের ঝুঁটি ধরে টান দিল। রাক্ষস চমকে উঠলো, বললো—কি ? কে ?

রাজকন্যা বললো—স্বপ্ন দেখছিলুম, একজন মস্ত বড় দৈত্য এসে তোমাকে মেরে ফেলেছে। বড় ভয় হোল।

রাক্ষস হা হা করে হেসে উঠলো, বললো—কেউ আমাকে মারতে পারবে না, আমার বুকের মাঝে তো ফুস্‌ফুস্‌ নেই।

রাজকন্যা বললো—তবে কোথায় আছে তোমার ফুসফুস্‌ ?

রাক্ষস হেসে বললো—ওই দেয়ালের মধ্যে।

পরদিন সকালে রাক্ষস বেরিয়ে গেলে রাজপুত্র আর রাজকন্যা দেয়াল ভাঙলো, অনেক দেখলো কিন্তু কোথাও রাক্ষসের ফুস্‌ফুস্‌ খুঁজে পেলে না। সন্ধ্যার আগে আবার দেওয়াল গেঁথে, ফুলপাতা সিঁদুর চন্দন দিয়ে সাজিয়ে রাখলো।

সন্ধ্যাবেলা রাক্ষস ফিরে এসে বললো—এ সব কি ?

—এর মধ্যে তোমার ফুস্‌ফুস্‌ আছে তাই পূজো করেছি, যেন ভালোমত থাকে ওখানে।

—পাগল ! ওই দেওয়ালের মধ্যে কিছুই নেই, আমি তোকে মিছে কথা বলেছিলুম। আছে ওই রান্নাঘরে উনুনের নিচে।

পরদিন উনুন খুঁড়ে রাজপুত্র দেখলো, কিন্তু কিছুই পেলে না। শেষে আবার উনুন গেঁথে ফুল-পাতা সিঁদুর-চন্দন দিয়ে সাজিয়ে রাখলো। রাক্ষস ফিরে এসে বললো—এ সব কি ?

—তোমার ফুস্‌ফুস্‌ আছে ওর নিচে তাই পূজো করেছি।

—পাগল ! আমার ফুস্‌ফুস্‌ ওখানে নেই, আছে সাগরদ্বীপের শিবমন্দিরে।

সাগর-দ্বীপের শিবমন্দিরে ? কে তার ঠিকানা বলবে ? কেমন করে সেখানে পৌঁছাবো ? রাজপুত্রের মনে পড়লো শকুনের কথা, পালক বের করে ডাকলো শকুনকে। শকুন আসতেই বললো—আমাকে পৌঁছে দাও, সাগর-দ্বীপের শিবমন্দিরে।

শকুন উড়লো রাজকুমারকে পিঠে নিয়ে। মেঘ পার হয়ে, সাত-সমুদ্দুর তেরো-নদী পার হয়ে নীল সাগরের অচিন দ্বীপের শিব-মন্দিরে এসে নামলো। শকুন বললো

—যা খুঁজছ তা পাবে মন্দিরের ওই পুকুরের নিচে—

পুকুরে অথই জল, রাজপুত্র মাছের আঁশ ধরে ডাকলো রুইমাছকে, বললো—জল থেকে তুলে দাও রাক্ষসের ফুস্‌ফুস্‌।

রুইমাছ ফুস্‌ফুস্‌ তুলে দিল। রাজপুত্র তলোয়ার বের করলো, ফুস্‌ফুস্‌টা টুকরো টুকরো করে ফেলার জন্য। কোথায় ছিল রাক্ষস, হুম্‌ হুম্‌ করে ছুটে এলো, বললো—মারিস্‌ নে বাপ্‌, মারিস্‌ নে!

—আমার ছ' ভাইকে পাষাণ করে রেখেছ, আগে তাদের মানুষ করে দাও পরে অন্য কথা।

রাক্ষস তখনই ছ' ভাইকে মানুষ করে দিল। বললো—এবার আমায় ছেড়ে দে, বাবা!

রাজপুত্র বললো—কিন্তু আমাদের ছ' রাজকন্যা?

—এখনি মানুষ করে দিচ্ছি—বলে রাক্ষস তখনি ছ' রাজকন্যাকে মানুষ করে দিল, তারপর বললো—এবার ছেড়ে দে, বাবা!

—এই যে দিচ্ছি! সারা জীবন ধরে অনেক মানুষ খেয়েছ, বেঁচে থাকলে পরে আরো কত মানুষ খাবে—বলে রাজপুত্র তলোয়ার দিয়ে কুচ্‌কুচ্‌ করে কেটে ফেললো ফুস্‌ফুস্‌ আর হৃদপিণ্ড। রাক্ষস বিকট চীৎকার করে সেখানেই ঘুরে পড়ে গেল—মরে গেল।

সাত ভাই এবার সাত রাজকন্যা নিয়ে দেশে ফিরলো। রাজার মুখে ফুটলো হাসি, রাণীমা আনন্দে ছেলেদের কোলে তুলে নিলেন। রাজ্যময় মহা ধুমধাম্‌ পড়ে গেল।

আমার গল্পটিও ফুরুলো!...

বন্দিনী রাজকন্যা

এক ছিল রাজা। প্রজাদের তিনি এতো ভালবাসতেন যে লোকে বলতো—রাম রাজত্বে বাস করছি।

কিন্তু এতো সুখ প্রজাদের কপালে সইল না। একদিন এক রাক্ষস এসে হানা দিল সেই রাজ্যে, একটি মেয়েকে ধরে নিয়ে গেল খাবার জন্যে।

পরদিন সন্ধ্যায় এসে আবার একটি মেয়েকে ধরে নিয়ে গেল। পরদিন আবার আর একজন।

রোজই সন্ধ্যায় রাক্ষসটি আসে,আর প্রথমেই যাকে চোখে পড়ে তাকেই ধরে নিয়ে যায়। দেশময় সাড়া পড়ে গেল, রাজ্যশুদ্ধ লোক ভয়ে ভয়ে থাকে—কবে কখন্ রাক্ষস এসে কার মেয়েকে ধরে খায়!

রাক্ষসের সঙ্গে লড়বে এমন লোকও কেউ নেই।

শেষে অনেক ভেবে-চিন্তে রাজা ঠিক করলেন—এক একদিন এক এক বাড়ীর পালা পড়বে, সেই বাড়ী থেকে মেয়ে পাঠাবে রাক্ষসের খাবার জন্য। আর সব বাড়ীর লোকেরা নিশ্চিন্ত থাকবে। লটারী করে নাম ঠিক হবে, কবে কার পালা।

এক একদিন লটারীতে এক একজনের নাম ওঠে। চোখের জল ফেলতে ফেলতে সে বেচারা নিজের মেয়েকে এগিয়ে দিয়ে আসে রাক্ষসের মুখে।

এই ভাবেই দিন যায়।

শেষে একদিন লটারীতে রাজারই নাম উঠলো। রাজার একটি মাত্র মেয়ে। রাজা বললেন—এ আমি কিছুতেই পারবো না। আমি নিজেই বরং যাই রাক্ষসের কাছে।

রাজকন্যা বললো—তা কি হয় বাবা, তোমার নিয়ম তুমি ভাঙবে কেমন করে? আর সবাই যা করলো তোমারও তাই করা উচিত। তা ছাড়া তুমি রাজা তুমি কার উপর রাজ্যের ভার দিয়ে যাবে? প্রজাদের দেখবে কে? আমিই যাব—!

সন্ধ্যাবেলা রাজকন্যা নগরের তোরণে এসে দাঁড়ালো একা। কিছুক্ষণ পরেই এক বিরাট রাক্ষস এসে দাঁড়ালো তার সামনে, বললো—

—হাঁউ মাঁউ খাঁউ
—মানুষের গন্ধ পাঁউ
—তুই কেরে?

—আমি রাজকন্যা।

—রাজকন্যা? তুই রাজার মেয়ে? দেখি দেখি—

রাক্ষস রাজকন্যাকে চোখের সামনে তুলে ধরলো। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে বললো—বাঃ, বেশ তো দেখতে, ঠিক যেন একটা মোমের পুতুল! নাঃ, তোকে আমি খাব না, সাজিয়ে রাখবো আমার ঘরে।

রাক্ষস রাজকন্যাকে নিয়ে এলো এক পাহাড়ের গুহায়, দু'চারটে ফলমূল খেতে দিল আর ঘাস—পাতা বিছিয়ে দিল, বললো—শো, তোর কোন ভয় নেই।

কিন্তু ভয় নেই বললেই তো আর ভয় কমে না, শুয়ে শুয়ে রাজকন্যা সারারাত ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে থাকে। ঘুম তার চোখে আসে না।

সকাল হতেই গুহার মুখে প্রকাণ্ড এক পাথর চাপা দিয়ে রাক্ষস বেরিয়ে গেল, বলে গেল—ভয় পাস্নে, আমি আবার সন্ধ্যাবেলা আস্বো।

গুহার মধ্যে যেটুকু আলো আসছিল, পাথর চাপা পড়ে তাও অন্ধকার হয়ে গেল। সেই আব্ছা অন্ধকারে রাজকন্যা একা বসে রইল। চারিপাশ থম্থম্ করছে। নানা কথা রাজকন্যার মনে উঠছে। এমন সময় খুট্খুট্ করে কিসের যেন একটা শব্দ হোল। রাজকন্যা দেখলো পাথরটার কোণে একটা যে ছোট ফাঁক আছে, সেই ফাঁক দিয়ে তার পোষা কুকুর-ছানাটি ভিতরে আসছে। কুকুরটিকে পেয়ে রাজকন্যা ভারী খুসি হোল। কাপড়ের একটা কোণ ছিঁড়ে নিয়ে মাটির ঢেলা দিয়ে লিখলো 'আমি বেঁচে আছি', তারপর মাথার একগাছি চুল দিয়ে সেটা বেঁধে দিল কুকুরের গলায়।

সন্ধ্যাবেলা কুকুরের গলায় ন্যাক্ড়ার চিঠি পেয়ে রাজা তো ভারী খুসি হলেন। পরদিন সকালে কুকুরের গলায় একখানি কাগজ আর একটি পেনসিল বেঁধে পাঠিয়ে দিলেন। রাজকন্যা সেই কাগজে সব কথা লিখে পাঠালো।

এমনি ভাবেই চললো দিনকয়েক। এর মধ্যে রাজকন্যার সঙ্গে

রাক্ষসের বেশ ভাব হয়ে গেছে। রাজকন্যা রাক্ষসের পাকা চুল বেছে দেয়, গান গেয়ে রাক্ষসকে ঘুম পাড়ায়।

হঠাৎ এক রাতে ঘুমুতে ঘুমুতে রাজকন্যা কেঁদে উঠলো। রাক্ষসের ঘুম ভেঙে গেল, বললো—কি হোল রাজকন্যে, কাঁদছিস্ কেন ?

রাজকন্যা বললো—একটা স্বপ্ন দেখছিলুম ঃ একটা লোক এসে তোমাকে গলা টিপে মেরে ফেললো, তারপর আমার হাতে পায়ে শিকল বেঁধে ধরে নিয়ে যাচ্ছে—

—কি বল্‌লি, একটা মানুষ এসে আমাকে গলা টিপে মেরেছে ?—রাক্ষস হেসে উঠলো—আমাকে গলা টিপে মারতে পারে এমন মানুষ আজও জন্মায় নি। তবে হ্যাঁ, একজন আছে বটে, সে কিরিলো মুচি। শুনেছি তার গায়ে নাকি আমার চেয়েও জোর বেশী, তবে সত্যি-মিথ্যে ভগবান জানেন।

রাজকন্যা পরদিন চিঠির কাগজে সব কথা লিখে কুকুরের গলায় ঝুলিয়ে দিলে।

রাজা তখনই দিকে দিকে লোক পাঠালেন—কোথায় থাকে কিরিলো মুচি, তাকে খুঁজে আনার জন্য।

নানাজন নানাদিক খুঁজে শেষে রাজ্যের এক সীমান্তে এক কুঁড়ে ঘর থেকে কিরিলো মুচিকে খুঁজে আনলো। কিরিলো মুচি হাত জোড় করে এসে দাঁড়ালো রাজসভায়।

রাজা বললেন—তোমাকে যেতে হবে রাক্ষস মারতে।

রাক্ষস মারতে ! কিরিলো চমকে উঠলো,—সেকি ! রাক্ষসের সঙ্গে গায়ের জোরে আমি পারবো কেন ?

—তুমিই পারবে, আর কেউ পারবে না।

কিরিলো বললো —মহারাজ, আমি পারবো না।

রাজা বললেন—তোমার দেশের জন্য এ কাজ তোমাকে করতেই হবে। দেশের কচি-কচি মেয়েগুলো রাক্ষসের পেটে যাবে, এই কি তুমি চাও? দেখ দিকি, এদের মুখের পানে তাকিয়ে!

একদল মেয়ে এসে দাঁড়ালো কিরিলোর সামনে। কিরিলো আর 'না' বলতে পারলো না। গায়ে লোহার বর্ম এঁটে, লোহার গদা হাতে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়লো রাক্ষস মারতে।

সন্ধ্যাবেলা ফিরে এসে গুহার মুখে কিরিলোকে দেখে রাক্ষস বললো—

হাঁউ মাঁউ খাঁউ
মানুষের গন্ধ পাঁউ
—তুই কে রে?

—আমি কিরিলো।

—কিরিলো? কিরিলো মুচি?

রাক্ষস চমকে উঠলো—তা, তুই এখানে এসেছিস্ কি করতে?

—তোকে মারতে।

—আমাকে মারতে? বটে! এতটুকু মানুষের এত বড় কথা! দাঁড়া তোর ভাঙছি মাথা।

রাক্ষস ঝাঁপিয়ে পড়লো কিরিলোর উপর।

কিরিলো তৈরীই ছিল, লোহার গদা ঘুরিয়ে রাক্ষসের মাথায় বসিয়ে দিল এক ঘা।

রীতিমত মারামারি বেধে গেল।

রাক্ষস কিরিলোর কিছুই করতে পারলো না, ঘণ্টা তিনেক লড়াই করে কিরিলো তাকে শেষ করে দিল।

তারপর রাক্ষসের মুণ্ডটা কেটে নিয়ে রাজকন্যার হাত ধরে কিরিলো নগরে ফিরলো। রাজ্যময় আনন্দের ঢেউ উঠলো, সবাইকার মুখে ফুটলো হাসি।

রাজা বললেন—তুমি কি চাও বল? অর্ধেক রাজত্ব? হীরে জহরৎ? টাকা পয়সা?

কিরিলো বললো—আমি কিছুই চাইনে মহারাজ, দেশের জন্য আমি রাক্ষস মারতে গিয়েছিলাম। দেশবাসীকে যে রক্ষা করতে পেরেছি, সেই আমার পুরস্কার। বড় লোক হতে আমি চাই না মহারাজ, আমি জুতো সেলাই করে খাই, সেই আমার ভালো।

নির্লোভ কিরিলো নিজের কুঁড়ে ঘরে ফিরে গেল। দেশের লোক ধন্য ধন্য করলো, এমন দেশভক্ত তারা আর দেখেনি।
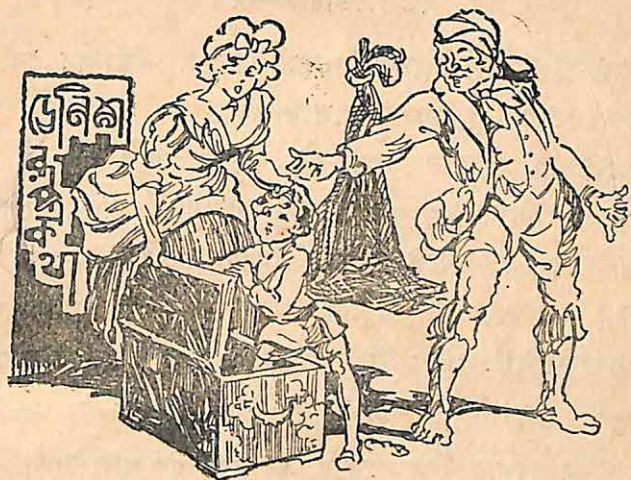
বেঁটে রাক্ষস

এক গাঁয়ে ছিল এক ঘর চাষা।

বড় গরীব তারা। কোন দিন খেতে পায়, কোন দিন বা পায় না। শেষে একদিন মনের দুঃখে ছেলেটিকে কোলে নিয়ে মা-বাপ পথে বেরিয়ে পড়লো।

কোথায় যাবে, কি করবে, কিছুই জানে না, তবু তারা সোজা পথ ধরে চললো। পথের মাঝে পড়লো এক গভীর বন। অন্ধকার বনের মাঝে দু'জনে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। ছেলে কোলে নিয়ে মা গেল এক দিকে, বাপ গেল আরেক দিকে। দু'জনে কত ডাকলো দু'জনকে, কিন্তু সেই জঙ্গলের মধ্যে কেউ কাউকে খুঁজে পেলে না,— যে যত খোঁজে, ততই হারিয়ে যায়।

জঙ্গলের মাঝে এলোমেলো ভাবে ঘুরতে ঘুরতে চাষা এসে পড়লো প্রকাণ্ড এক বাড়ীর সামনে। বনের মাঝে এমন বাড়ী দেখা যায় না। দরজা খোলাই ছিল। ভিতরে একজন বেঁটে লোক বসে

তামাক খাচ্ছিল, চাষা তাকে জিজ্ঞাসা করলো—আমার বৌ আর ছেলেকে দেখেছেন? তারা এসেছে এখানে?

—তোমার বৌ আর ছেলে, কই দেখিনি তো?

—তাই তো, তাহলে তারা গেল কোথায়, দেখি—বলে চাষা বেরিয়ে আসছিল, বেঁটে বললো—আহা, এরই মধ্যে চললে কোথায়? এই বনের মাঝে কত পথ ঘুরতে ঘুরতে আমার বাড়ী এলে, একটু বসো, দুটো মুড়ি আর দু'খানা বাতাসা খেয়ে যাও—!

চাষাকে মুড়ি-বাতাসা খাইয়ে বেঁটে বললো—তুমি বড় গরীব লোক, টাকা-পয়সার খুবই দরকার, এই নাও এক থলি টাকা। তবে একটা কথা বাপু, আমার একটা চাকরের দরকার হবে, তোমার ছেলেটা একটু বড় হলে পাঠিয়ে দিও।

চাষা বললে—তার মানে? এই টাকা দিয়ে তুমি আমার ছেলেকে কিনে নিতে চাও? সে হবে না।

বেঁটে বললো—বেশ, ছেলে না আসে তুমিই এসো।

চাষা বললো—টাকা আমার চাই না।

—টাকা না চাও, নিও না। কিন্তু তোমাকে তো আমি এখন ছাড়বো না। মুড়ি-বাতাসার দাম দেবে, তারপর এখান থেকে বেরুবে।

চাষা এবার সত্যি ভয় পেল। আর সেখানে দাঁড়ালো না। সামনের দরজা খোলাই ছিল, তীরের মত ছিট্‌কে পড়লো বাইরের জঙ্গলে। ছুটতে ছুটতে বনের মাঝে এবার সে পথ খুঁজে পেলে, ফিরে এলো নিজের গাঁয়ে।

এদিকে চাষা-বৌ বনের মাঝে পথ হারিয়ে এক গাছতলায় বসে কাঁদতে সুরু করে দিলে। তার কান্না শুনে এক বামন এসে বললো—

ও চাষা-বৌ কাঁদছিস্ কেন, আমার বাড়ী যাবি? আমার একটা ঝিয়ের দরকার—থাকতে দোব, খেতে দোব।

চাষা-বৌ বললো—চলো।

বামন থাকতো এক পাহাড়ের গুহায়, কতদিনের ধুলো আর জঞ্জাল জমেছিল সেখানে। চাষা-বৌ তখনই সব ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে করে ফেললো। বামন তো ভারী খুসি, বললো—তোর কাজ দেখে বড়ই সন্তুষ্ট হয়েছি চাষা-বৌ, তোর ছেলের জন্য একটা বাক্‌স দিচ্ছি, বড় হলে এটা তাকে দিস্। এর ভিতর আছে একটা ভাল্লুকের লোম, একটা রুই মাছের আঁশ, আর একটা বকের পালক। লোমটা ধরে ডাকলেই ভাল্লুকের রাজা আসবে, আঁশটা ধরে ডাকলেই মাছের রাজা আসবে, পালকটা ধরে ডাকলেই পাখীর রাজা আসবে। তাদের যা হুকুম করা হবে তারা তাই করবে। বিপদের দিনে এই বাক্‌সটি তোর ছেলের অনেক কাজে লাগবে। আর আমি আশীর্বাদ করছি, তোর এই ছেলে একদিন রাজার মেয়েকে বিয়ে করে অর্ধেক রাজত্ব পাবে—রাজা হবে!

বামন চাষা-বৌকে জঙ্গলের বাইরে পৌঁছে দিয়ে গেল।

চাষা-বৌয়ের তো আনন্দ ধরে না, বাড়ী ফিরেই পাড়া-পড়শীর কাছে কথায়-কথায় গল্প করলো—বামন বলেছে আমার ছেলে রাজ-কন্যাকে বিয়ে করে অর্ধেক রাজত্ব পাবে—রাজা হবে!

লোকের মুখে-মুখে কথাটা একদিন রাজার কানে গিয়ে পৌঁছালো। রাজার ভ্রূ কুঁচকে উঠলো, ভাবলেন—বটে! স্পর্ধা তো কম নয়! চাষার ছেলে রাজার মেয়েকে বিয়ে করতে চায়? দেখতে হবে তো সে কেমন ছেলে!

একদিন রাজা নিজেই গেলেন চাষার বাড়ী, দেখে-শুনে বললেন

—বাঃ বেশ ছেলে তো! ওকে আমি নিয়ে যাই, আমার বাড়ীতে মানুষ হবে।

চাষা যেন হাতে স্বর্গ পেলে, তখনই ছেলেটিকে সঁপে দিলে রাজার হাতে।

সেই রাত্রে ঘুমন্ত ছেলেটিকে এক কাঠের সিন্দুকের ভিতর ভরে রাজা নদীর জলে ভাসিয়ে দিলেন, ভাবলেন—যাক্, আপদ গেল!

কাঠের সিন্দুক ভাসতে ভাসতে এসে লাগলো নদীর ধারে এক গাঁয়ে। এক জেলে দেখতে পেয়ে ডাঙ্গায় তুলে আনলো। খুলে দেখে চমৎকার ফুট্‌ফুটে একটি ছেলে। জেলে তো ভারি খুসি। তার ছেলে-মেয়ে ছিল না। জেলে-বৌ নিজের ছেলের মত তাকে মানুষ করতে লাগলো।

এদিকে একদিন জঙ্গলের সেই তামাক-খোর বেঁটে এসে চাষাকে বললো—কই গো, তোমার ছেলেকে যে আমার বাড়ী পাঠাবার কথা ছিল, তার কি হোল? আমার যে একজন চাকরের দরকার।

চাষা তো তাকে দেখেই ভয় পেয়ে গেল, বললো—ছেলেকে রাজা নিয়ে গিয়ে মানুষ করছেন।

বেঁটে গেল রাজবাড়ীতে, বললো—রাজা মশাই, চাষার ছেলেটা কোথায়?

রাজা বললেন—জানি না, কোথায় চলে গেছে।

বেঁটে বললো—অতটুকু ছেলে কোথায় গেল, আপনি একবার খোঁজ করলেন না?

রাজা বললেন—আমার সময় নেই।

—কিন্তু তাকে তো আমার এখনি চাই, মহারাজ!

—বলছি তো, তার খবর আমি কিছু জানি না।

—বেশ, তাহলে সেই ছেলের বদলে রাজকন্যাকে নিয়ে এখন চললাম। ছেলেটিকে পেলে তোমার মেয়েকে ফেরৎ দোব—বলে রাজকন্যার হাত ধরে চকিতে বেঁটে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তারপর বরাবর চাষার কাছে এসে বেঁটে বললো—তোমার ছেলের বদলে তুমিই তাহলে চল। মুড়ি-বাতাসার দাম পাওনা আছে।

চাষা কি বলবে ভেবে পেলে না, বেঁটে চাষার হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো।

ওদিকে রাজা তো রাজকন্যার শোকে পাগল হয়ে গেলেন, ঢাক পিটিয়ে দিলেন—যে আমার মেয়েকে ফিরিয়ে আনতে পারবে তাকে অর্ধেক রাজত্ব দোব।

আর চাষা-বৌ পাগলের মত কেঁদে কেঁদে পথে পথে ঘুরতে লাগলো,—কোথায় তার ছেলে? কোথায় তার স্বামী?

ঘুরতে ঘুরতে কত মাঠ ঘাট গ্রাম পার হয়ে চাষা-বৌ এসে পৌঁছালো নদীর ধারে সেই জেলেপাড়ায়। একদিন হঠাৎ তার নজরে পড়লো এক বাড়ীর দরজায় একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক তার হারিয়ে যাওয়া ছেলের মত—সেই মুখ, সেই চোখ, তবে এই ক'বছরে অনেকটা বড় হয়েছে। চাষা-বৌ এগিয়ে গিয়ে ডাকলো—খোকা!

খোকাও চিনতে পেরেছিল, চাষা-বৌয়ের কোলে সে ঝাঁপিয়ে পড়লো, ডাকলো—মা!

মায়ে-ছেলেতে সুখদুঃখের অনেক কথাই হোল।

খোকা বললো—আমি আজই যাব, বেঁটে সয়তানটার কাছ থেকে বাবাকে ছাড়িয়ে আনবো।

মা বললো—তুই পারবি কেন বাবা তার সঙ্গে, তুই যে নেহাৎ ছেলেমানুষ!

—তা হোক, আমি আজই যাব, তুমি আমাকে সেই বামনের দেওয়া আশীর্বাদী কৌটোটা দাও দিকি।

চাষা-বৌয়ের আঁচলে কৌটোটা বাঁধা ছিল, ছেলের হাতে দিল।

খোকা তো তখনই পথে বেরিয়ে পড়লো। কিন্তু কোথায় যাবে? কোন্ পথে? তবু এগিয়ে চললো যেদিকে দু'চোখ যায়।

চলেছে তো চলেছেই, পথের যেন আর শেষ নেই। কত পাহাড়-পর্বত বন-জঙ্গল পার হয়ে গেল—পূব্ দিকের সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ে তবু পথ আর ফুরায় না।

এক বনের ধারে এক কাঠ-কুড়ানী বুড়ীর সঙ্গে দেখা। মাথায় এক বোঝা কাঠ নিয়ে অনেক কষ্টে লাঠি ধরে কাঁপতে কাঁপতে চলেছে। দেখে খোকার বড় কষ্ট হোল, বললে—দেখ্ বুড়ী, কাঠের বোঝাটা তুই যখন বইতে পারছিস্ নে, আমার মাথায় চাপিয়ে দে, আমি পোঁছে দিয়ে আসি।

কাঠের বোঝাটা খোকা বুড়ীর বাড়ী পোঁছে দিল। বুড়ী তো ভারী খুসি, বললো—এই রাতে কোথায় আর যাবি, এখানেই থাক্। আমার বাড়ীতে এক বেঁটে রাক্ষস থাকে, সে এখনি আসবে, তাকে জিজ্ঞাসা করবো তোর বাবার কথা।

খোকাকে বুড়ী খড়ের গাদায় লুকিয়ে রাখলো।

সন্ধ্যার পর বেঁটে রাক্ষস বাড়ী ফিরলো, ঘরে ঢুকে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে দু'চারটে নিঃশ্বাস ফেলেই বললো—

ঠিক তাই, ঠিক তাই—
মানুষ-বাচ্চার গন্ধ পাই !

বুড়ী বললো—তা'তো পাবেই। দিন রাত কেবল মানুষ-বাচ্চাই খুঁজছ কিনা ! কাল স্বপ্ন দেখি এক রাজকন্যেকে ধরে এনেছ ?

বেঁটে বললে—রাজকন্যে তো ? তুই ঠিক দেখেছিস। কিন্তু

তাকে আমি তো ধরে আনি নি, তাকে ধরে নিয়ে গেছে আমার এক ভাই, ঠিক আমারই মত দেখতে।

—তোমার ভাই? কই তাকে তো কোন দিন দেখিনি? কোথায় থাকে সে?

—সে এখান থেকে অনেক দূরে, বনের ওধারে, নদীর ওপারে।

চাষার ছেলে আড়াল থেকে সব কথাই শুনলো। মাঝ রাতে রাক্ষস ঘুমুলেই সেখান থেকে সে বেরিয়ে পড়লো। বাইরে বন, অন্ধকারে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে, কোন দিকে চোখ চলে না। মায়ের দেওয়া কৌটোটী খুলে পাখীর পালকটী হাতে নিয়ে সে ডাকলো—পাখী! অ পাখী!!

তখনই এক প্রকাণ্ড ঈগল পাখী এসে বললো—কি করতে হবে খোকাবাবু? হুকুম করুন।

—আমাকে বনের ওধারে, বেঁটে রাক্ষসের বাড়ী নিয়ে চলো।

—আমার পিঠের উপর উঠে বসুন।

চাষার ছেলেকে পিঠে নিয়ে পাখী উড়লো আকাশে। সারারাত উড়ে সকালে এসে পৌঁছালো রাক্ষসের বাড়ীতে। কিন্তু রাক্ষসটা তাদেরকে আগেই দেখতে পেয়েছিল, যেই তারা মাটীতে নামতে গেল অমনি তেড়ে এলো। হাঁ করে সবাইকে সে গিলে খেতে আসে। কোনখানেই তারা নামতে পারে না।

পাখী বললো—কি করি খোকাবাবু?

খোকাবাবু বললো—নদীর ওপারে ফিরে চল।

এপারে এসে চাষার ছেলে সারাদিন বসে রইল এক গাছতলায়। রাত্রিতে মাছের আঁশটা হাতে নিয়ে ডাকলো—মাছ! অ মাছ!!

প্রকাণ্ড এক মাছ ভেসে এলো জলের কিনারায়, বললো—কি করতে হবে খোকাবাবু? হুকুম করুন।

—আমায় চুপি চুপি ওপারে নিয়ে চল।

—বেশ, আমার পিঠে উঠে বসুন।

চাষার ছেলেকে পিঠে নিয়ে মাছের রাজা নদী পার করে দিল।

মাঠের মাঝে অন্ধকারে কোথায় যাবে কিছু ঠিক করতে না পেরে চাষার ছেলে ভাল্লুকের লোমটি হাতে নিয়ে ডাকলো—ভাল্লুক! অ ভাল্লুক!

অন্ধকারের মাঝে মিশ্ কালো এক ভাল্লুক এসে বললো—কি করতে হবে খোকাবাবু? হুকুম করুন।

—আমাকে বেঁটে রাক্ষসের বাড়ীতে নিয়ে চল,—

—সেখানে গিয়ে তুমি কি করবে খোকাবাবু?

—বেঁটে রাক্ষসকে মেরে আমার বাবা আর রাজকন্যাকে উদ্ধার করবো।

—কিন্তু তোমাকে দেখতে পেলেই তো বেঁটে রাক্ষস তখনই তোমাকে মেরে ফেলবে। তার সঙ্গে তুমি লড়বে কি দিয়ে? তোমার অস্ত্র কই? ঢাল-তলোয়ার?

খোকাবাবু বললো—তাইতো! তাহলে?

ভাল্লুক বললো—দাঁড়াও, আগে আমি সবাইকে ডেকে একবার জিজ্ঞাসা করি।

তখনই ভাল্লুক সবাইকে ডেকে পাঠালো। বনের যত জানোয়ারের এক সভা বসে গেল সেখানে। সবাই বললো—তাইত? কি হবে?

এক খরগোস বসেছিল এক কোণে, সে বললো—কোন ভয়

নেই, খোকাবাবুকে আমি একখানা তলোয়ার দোব। সেই তলোয়ার হাতে থাকলে ওই বেঁটে রাক্ষস কিছুই করতে পারবে না। আমি মন্ত্র পড়ে দোব সেই তলোয়ারে।

খরগোস একখানি ঝক্‌ঝকে তলোয়ার এনে দিল খোকাবাবুকে।

ভোরবেলা সেই তলোয়ার হাতে নিয়ে চাষার ছেলে গিয়ে ঢুকলো রাক্ষসের বাড়ীতে। রাক্ষস তেড়ে এলো। সুরু হোল তুমুল লড়াই। মাটী কেঁপে উঠলো, গাছ উপড়ে পড়লো, পাহাড়ে ভাঙন ধরলো, বেঁটে রাক্ষস কিন্তু খোকাবাবুর সঙ্গে পেরে উঠলো না। এক ঘা করে তলোয়ারের ঘা খায় আর রাগে কিড়মিড় করে ওঠে। কিন্তু সেই মন্ত্রপড়া তলোয়ারের সামনে সে দাঁড়াতে পারে না। তলোয়ারের ঘা খেয়েই সে মারা পড়লো।

তারপর সেখান থেকে চাষাকে আর রাজকন্যাকে সঙ্গে করে খোকাবাবু ফিরে এলো নিজের দেশে।

রাজামশাই মেয়েকে ফিরে পেয়ে তো বেজায় খুসি হলেন। চাষার ছেলের সঙ্গেই রাজকন্যার বিয়ে দিলেন আর দিলেন অর্ধেক রাজত্ব। চাষার আর কোন দুঃখকষ্ট রইল না, পরম সুখে তাদের দিন কাটতে লাগলো।

আমার কথাটিও ফুরুলো—

রামপাল তিলক সিং

এক ছিল তাঁতী। তার ছিল এক মেয়ে। যেমন সুন্দরী ছিল মেয়েটীকে দেখতে, তেমনি গুণও ছিল অনেক। তাঁতী মেয়েটিকে বড্ড ভালবাসতো। যেখানে-সেখানে গর্ব করে বলতো—এমন মেয়ে লাখে একটা মেলে না, মনে করলে শুক্‌নো খড় থেকে সোনার জরী কাটতে পারে। আমার এই যে সব জরী-পাড় কাপড়—এসব সেই জরী থেকেই তৈরী।

লোকের মুখে মুখে কথাটা একদিন রাজার কানে উঠলো ঃ শুক্‌নো খড় থেকে সোনার জরী!

তখনই রাজা তাঁতীর মেয়েকে ডেকে পাঠালেন, বললেন—তুমি খড় থেকে জরী কাটতে পার? তোমার বাবা যে বলেন?

—আজ্ঞে, বাবা একটু বাড়িয়ে বলেন, ও কথা সত্যি নয়।

—আমি কোন কথা শুনতে চাই না, তোমাকে আমি এক আঁটি

খড় দিচ্ছি, আজ রাতের মধ্যে সব জরী কেটে রাখবে, না হলে তোমার গর্দান যাবে!

একটী ঘরে খড় আর একটী চরখা দিয়ে রাজা দরজা বন্ধ করে চলে গেলেন। মেয়েটী কি যে করবে ভেবে পেলে না, শেষে ঘরের এক কোণে বসে কান্না জুড়ে দিলে।

সারাটা দিন কেঁদে কেঁদে সন্ধ্যাবেলা তাঁতী-মেয়ের একটু তন্দ্রা এসেছে এমন সময় ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলো এক বামন, বললো—নমস্কার দিদির্মাণ!

তাঁতী-মেয়ে চমকে উঠলো, দেখে সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক হাত লম্বা এক মানুষ, মাথায় মস্ত টাক, মুখে লম্বা দাড়ী।

বামন বললো—কাঁদছ কেন দিদিমণি?

—রাজা হুকুম দিয়েছেন এই সব খড় থেকে সোনালী জরী বের করতে হবে, না হলে গর্দান যাবে।

বামন বললো—তার জন্য এতো কান্নার কি আছে? আমি এখনি সব ঠিক করে দিচ্ছি, কিন্তু আমাকে কি বক্‌শিষ্ দেবে দিদিমণি?

—কি দোব? কি দোব?…বেশ, এই সোনার হার ছড়া দোব।

—বেশ—বলে বামন তখনই খড় থেকে সোনার সুতো কাটতে বসে গেল।

দুপুর রাতে সুতো কাটা শেষ করে তাঁতী-মেয়ের গলার হার নিয়ে বামন চলে গেল।

সকাল বেলা রাজা মশাই খড়ের জরী দেখে তো বেজায় খুসি, সেদিন আর এক ঘর খড় দিয়ে বললেন—আজ এগুলো সব সুতো কেটে রাখবে—

তাঁতীর মেয়ে কি করবে ভেবে পেলে না, বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলো।

সারাটা দিন কেটে গেলে, সন্ধ্যাবেলা খুট্ করে জানালা খুলে বামনটী আবার এসে দাঁড়ালো বললো—নমস্কার দিদিমণি!

—নমস্কার!

—আজ আবার কি এই এক ঘর খড় থেকে জরীর সুতো কাটতে হবে? বেশ তাই করে দোব, কিন্তু আমাকে কি বকশিষ দেবে, দিদিমণি?

—কি দোব?···কি দোব···বেশ, এই সোনার আংটিটা দোব···

—বেশ—বলে বামন সুতো কাটতে বসে গেল। ভোর হবার আগেই সব সুতো কাটা শেষ করে আংটি নিয়ে চলে গেল।

সকালবেলা এক ঘর জরী দেখে রাজা তো বেজায় খুসি। সেদিন আরো বড় এক ঘরে আরো বেশী খড় দিয়ে বললেন—আজ এই সব খড় থেকে সোনালী জরী কেটে দাও।

তাঁতী-মেয়ে বললো—রোজই কি আমাকে এই জরী তৈরী করতে হবে মহারাজ?

রাজা লজ্জা পেলেন, বললেন—না, আর করতে হবে না, আজকেই শেষ।

তাঁতী-মেয়ে সাহস পেয়ে বললো—এত যে জরী তৈরী করে দিলাম মহারাজ, আমায় তো কিছু দিলেন না?

রাজা বললেন—নিশ্চয় দোব! আজ রাতে এই সব জরী কেটে দিলে কাল তোমাকে আমার রাণী করবো।

রাজা তো চলে গেলেন, তাঁতী-মেয়ে বসে রইল কখন্ বামন আসে—সেই পথ চেয়ে।

সন্ধ্যাবেলা বামন এলো, বললো—আজ কি দেবে, দিদিমণি?

—আজ কি দোব?…কি দোব?…তাইতো কি দোব? অনেক ভেবে-চিন্তে তাঁতী-মেয়ে বললো—তাইত, আজ তো আর কিছু দেবার নেই।

বামন বললো—বেশ, এখন কিছু না দাও তো পরে দিও। কিন্তু কি দেবে বল?

—তুমি যা চাইবে?

—বেশ, তাহলে তুমি রাণী হবার পর তোমার যে ছেলে হবে, সেটিকে আমার চাই! যদি দাও, তাহলে কাজ করি, নাহলে সব পড়ে থাক, আমি যাই।

তাঁতী-মেয়ে তাড়াতাড়ি বললো—না না না, যাবে কি? বললাম তো, তুমি যা চাইবে তাই দোব।

বামন বললো—তা হলে এই কথাই রইল?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ—তাঁতী-মেয়ে তিন সত্যি করলো।

বামন হাসিমুখে জরীর সুতো কাটতে বসলো। রাতের মধ্যেই ঘর-ভরা খড়ে ঘর-ভরা জরী তৈরী হয়ে গেল।

সকালবেলা ঘরভর্তি জরী দেখে রাজামশায় তো ভারী খুসি, বললেন,—তোমার মত মেয়েকেই আমি রাণী করবো!

রাজার সঙ্গে তাঁতী-মেয়ের বিয়ে হলে গেল।

দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়, কতদিন পরে রাণীর একটী ফুট্‌-ফুটে ছেলে হোল। রাজ্যময় আনন্দের উৎসব পড়ে গেল। ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলা বামন এসে দাঁড়ালো রাণীর সামনে, বললো—রাণীমা, সেই যে কথা দিয়েছিলেন, মনে আছে তো?

রাণী চমকে উঠলেন, বামনের কথা তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন, বললেন—কি কথা বলত ?

বামন বললো—বেশ ! এরই মধ্যে ভুলে গেলেন ? আপনি তিন সত্যি করেছিলেন আপনার প্রথম ছেলেটিকে আমায় দেবেন।
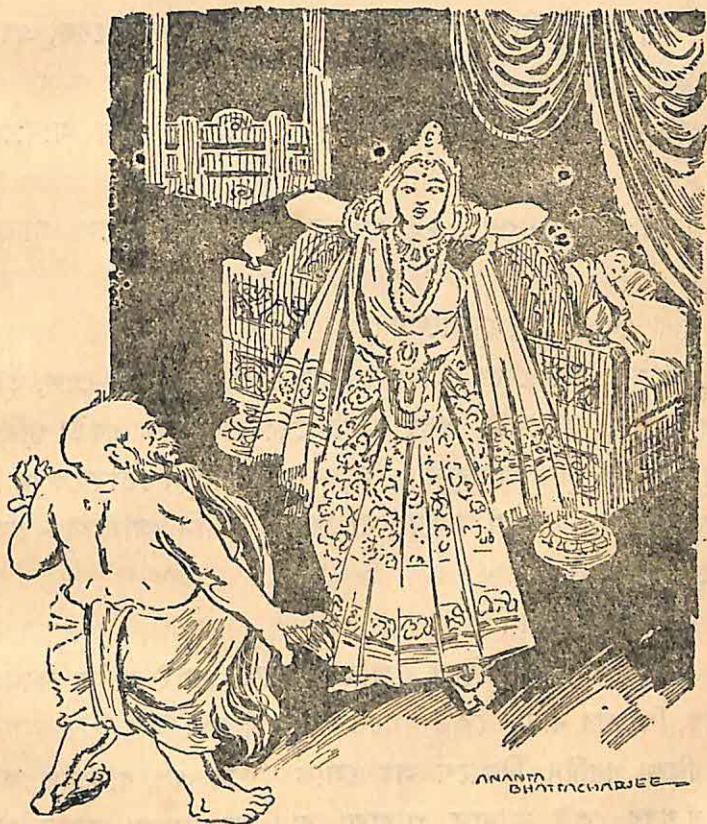
রাণীমা বললেন—ভুলবো কেন গো, ঠিক মনে আছে। তবে কি জান ? মা কখনও তার ছেলেকে বিলিয়ে দিতে পারে, তুমিই

বল? তুমি বরং তার বদলে টাকাকড়ি সোনাদানা কি চাও বল, এখনই তাই দিচ্ছি।

—টাকাকড়ি সোনাদানা কিছুই আমি চাই না, আমি ছেলে চাই।

—ধরো, তোমাকে যদি আমি একটা জমিদারী দিই?

—না, না। জমিদারী আমি চাইনে। তুমি কথা দিয়েছ, এখন সেই কথা রাখবে কি না তাই বল?

রাণী বললেন—তখন না-বুঝে কথা দিয়েছিলাম, তুমি আমাকে মাপ কর।

বামন বললো—ওসব কিছু আমি শুনতে চাই না, ছেলে আমার চাই।

রাণী এবার কেঁদে ফেললেন।

চোখের জল দেখে বামনের দয়া হোল, বললো—বেশ, তুমি যখন নেহাৎ কান্নাকাটি করছ আমি তোমাকে তখন একটা সুবিধা দিলাম। যদি তুমি আমার নাম বলতে পার, তাহলে তোমাকে আমি ছেড়ে দোব। কাল সন্ধ্যাবেলা আবার আমি আসবো—তখন বলতে হবে।

বামন চলে গেল।

রাণী তখনই চারিদিকে লোক পাঠালেন, সেই বামন কোথায় থাকে, কি তার নাম,—কেউ বলতে পারে কি না।

কিন্তু পরদিন বিকালে সব লোক ফিরে এল, বামনের কোন খোঁজ-খবর কেউ আনতে পারলো না। সন্ধ্যাবেলা বামন এসে দাঁড়ালো, রাণী বললেন—বসো।

—না না বসবো না, আমার নাম বলতে পারবে তো বল?

রাণী যত নাম জানতেন একে একে বলতে সুরু করলেন,—রমেশ, সনৎ, অমূল্য, অনিল, শচীন···

—না না না, ওরকম নামই আমার নয়।

রাণী বললেন—তবে বুলটু, ঘণ্টু, ভজা, হাবু···

—না না না, ওরকম নামই নয়।

—তা'হলে ?

বামন বললো—বেশ, আমি আজ চললাম, কাল আবার আসবো। কাল আমার নাম না বলতে পারলে ছেলে দিতে হবে।

বামন গট্ গট্ করে চলে গেল।

রাণীর তো সারারাত ঘুম নেই। কতজনকে কতদিকে যে পাঠালেন, তার আর লেখা-জোখা নেই। বললেন—যে খবর আনতে পারবে তাকেই তিনি হাজার হাজার মোহর পুরস্কার দেবেন।

কিন্তু পরদিনও কেউ কোন খবরই আনতে পারলো না। রাণীর মাথায় তো আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। কি করবেন তিনি ভেবে পেলেন না। সন্ধ্যাবেলা বামন আসতেই পুরাণ রামায়ণ মহাভারতের যত পুরাণো নাম জানা ছিল রাণী সব বলতে সুরু করলেন—তোমার নাম তিমিরবরণ, চন্দ্রমোহন, মুরলীধর, বঙ্কিমবিহারী, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, জয়দ্রথ, অনিরুদ্ধ, হরিচরণ, শ্যামসুন্দর।

বামন বললো—না না না। ওর একটাও আমার নাম নয়। ছেলে দাও, আমি চলে যাই।

রাণী কাকুতি-মিনতি করে বললেন—আমাকে আর একদিন সময় দাও।

বামন বললো—বেশ, বার বার তিনবার! কাল যদি না বলতে পার, তাহলে আমি ঠিক ছেলে নিয়ে যাব।

সেই রাত্রে রাণী আবার নতুন করে চারিপাশে লোক পাঠালেন। আর একদিন মাত্র সময়, এই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে হবে। কিন্তু সত্যই শেষ অবধি কেউ কোন খবর আনতে পারবে বলে রাণীর বিশ্বাস হোল না। কাল কি করবেন সেই ভাবনায় সারারাত তিনি সুস্থির হাতে পারলেন না। দেশময় ঢাক পটিয়ে দিলেন—বামনের খবর চাই। খবর আনতে পারলে যা চাও তাই পাবে—হাজার হাজার টাকা, জায়গা-জমি, বাড়ী-ঘর—যা খুসি—

দুপুরবেলা এক চাষা এসে খবর দিল,—কাল রাতে বনের মাঝে এক গাছে উঠে বসেছিলাম, রাতদুপুরে গাছের নিচে আগুন জ্বলে উঠলো, দেখি এক দাড়ীওয়ালা টাক-মাথা বামন আগুনের চারি-পাশে নাচছে আর গাইছে—

কচি ছেলে বেজায় ভালবাসি।
খেলে পরে হয়না হাঁচি কাশি।
আজ করি রান্না, কাল বাসি খাই
নাই কোন ভাবনা, নাচি আর গাই।
নামটী আমার জানে না কেউ—
বলবে কেমন করে ?
রামপাল তিলক সিং—
নাচি দাড়ী ধরে।

রাণীর মন তো আনন্দে নেচে উঠলো, তখনই লোকটীকে অনেক টাকাকড়ি সোনাদানা বক্‌শিস্ দিলেন। তারপর সন্ধ্যাবেলা বামন আসতেই বললেন—বসো।

—না না বসবো না, যা বলবার তাড়াতাড়ি বল, নাহলে ছেলে দাও, নিয়ে যাই—

—তবে শোন, তোমার নাম—বক্কেশ্বর, বেঁটে-বক্কু, কোলকুঁজো, হাঁড়িমুখো, দেড়ো, বিট্‌লেবুড়ো।

—কি! নাম বলতে পারবে না আবার আমাকে গাল দেওয়া হচ্ছে!—রাগে বামনের চোখ মুখ লাল হয়ে উঠলো, বললো—দাও, ছেলে দিয়ে দাও, আমি এখনই চলে যাব—

—তবে!—মুখখানি গম্ভীর করে রাণী বললেন—তোমার নাম কি তাহলে রামপাল তিলক সিং?

—আঁ! কী! কি করে জানলে আমার নাম? নিশ্চয়ই সেই ডাইনীবুড়ী বলে দিয়েছে। ডাইনীগুলো আমার চিরকালের শত্রু। ওদের সঙ্গে একবার বোঝাপড়া করতেই হবে—

রাগে কাঁপতে কাঁপতে দাড়ী ছিঁড়তে ছিঁড়তে বামন সেখান থেকে ঠিক্‌রে চলে গেল। বামনের গতিক দেখে সবাই তো আর হেসে বাঁচে না।

ডাইনীর গল্প ঃ

তিন বন্ধু

এক ছিল রাজা। রাজার বয়স হয়েছিল, অনেক চুল পেকে শাদা হয়ে গেছে, কপালে পড়েছে চিন্তার রেখা। একদিন ছেলেকে ডেকে রাজা বললেন—বাবা, আমি বুড়ো হয়েছি, আর তো পারিনা। এবার তোমাকে রাজা হতে হবে। এবার দেখে-শুনে একটা বিয়ে কর, রাণী না হলে তো রাজ্যাভিষেক হয় না। আমার ছবি-ঘরে দশ-দিকের দশ রাজকন্যার ছবি সাজানো আছে, তার মধ্যে যাকে ইচ্ছা তুমি পছন্দ করতে পার। আমি বিয়ের সব জোগাড় করি।

রাজকুমার ছবি-ঘরে এলো ছবি দেখতে। দশ-দিকের দশ রাজকন্যার দশখানি ছবি সাজানো। প্রত্যেকটি মেয়ে নিখুঁত সুন্দরী, তবু তার পছন্দ হয় না একজনকেও। সব শেষে আর একখানি ছবি রেশমী চাদর দিয়ে ঢাকা দেওয়া ছিল। চাদর সরিয়ে দেখলো একটী মেয়ে কাঁদছে, চোখের জল টল্ টল্ করেছে মুক্তার মত। রাজকুমার বললো—বাবা! ওই মেয়েটীকে আমি বিয়ে করবো।

রাজা বললেন—ও যে পাষাণ-পুরীর অশ্রুমতী রাজকন্যা, যে ওর দেশে যায় সেই পাষাণ হয়ে যায়। এক ডাইনী ওর চারিপাশে গণ্ডী দিয়ে রেখেছে। ওর বাপ-মা ভাই-বোন সবাই পাষাণ হয়ে গেছে, তাই ওর চোখে জল।

—সেই ডাইনীকে আমি মারবো, ওকে আমি উদ্ধার করবো,—বলে রাজকুমার কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে, ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেরিয়ে পড়লো। লোকালয় ছাড়িয়ে, বনবাদাড় পার হয়ে, তেপান্তরের মাঠে তার ঘোড়া ছুটলো—কোথায় সেই পাষাণপুরী? কোথায় তার ডাইনীবুড়ী?

তেপান্তরের পারে বনের ধারে একটি লোক বসে ছিল, রাজকুমারকে ডেকে বললো—রাজপুত্র, আমি তোমার সঙ্গে যাব। আমি তোমার কাজ করবো।

রাজপুত্র বললো—কি কাজ করবে? আমি যাচ্ছি পাষাণপুরীর ডাইনী-বুড়ীর খোঁজে, অশ্রুমতী রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে। তুমি কোথায় যাবে?

—আমি সেখানেই যাব তোমার সঙ্গে।

—বেশ চলো—বলে রাজপুত্র ঘোড়া ছোটালো।

লোকটী হাসলো, বললো—এভাবে ঘোড়া ছোটালে সেদেশে পৌঁছাতে তোমার লাগবে এক বছর। ঘোড়া এই বনে ছেড়ে দাও, আমার পিঠে উঠে বসো, এক বেলায় পোঁছে দেব এক বছরের পথ। পাহাড়-পর্বত বনবাদাড় পার হয়ে আমি চলে যাব, সেইজন্যেই তো আমায় নাম 'দীর্ঘপদ'।

দেখতে দেখতে দীর্ঘপদ মাথা তুললো তালগাছ ছাড়িয়ে, যেন রবারের পুতুল টেনে লম্বা হোল। তারপর রাজকুমারকে তুলে নিল কাঁধে, বললো—চলো!

লম্বা লম্বা পা ফেলে সে চললো। এক এক পদক্ষেপে চললো এক এক ক্রোশ।

পাশে পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে দু'জন লোক বসে গল্প

করছিল। দীর্ঘপদ বললো—ওরা আমার বন্ধু, ওদেরকে সঙ্গে নিই, রাজকুমার !

একজনের বিরাট ভুঁড়ী, অপরের হু'চোখ বাঁধা। রাজপুত্র বললো —ওরা কি কাজে আসবে ? একজন পেট-মোটা আরেকজ তো অন্ধ।

—ওই পেট-মোটার নাম লম্বোদর, ও ইচ্ছা করলে একটা সাগর শুষে নিতে পারে, ওর পেটে এতো জায়গা। আর অন্ধটি হচ্ছে

ভস্মলোচন, কোন কিছুতেই ওর দৃষ্টি বাধে না, খোলা চোখে তাকালেই তা ভস্ম হয়ে যায়। ওদের দু'জনকেই আমরা সঙ্গে নিই। পাষাণ-পুরীতে হয়তো ওদের দরকার হবে।

দীর্ঘপদ, লম্বোদর আর ভস্মলোচনকে কাঁধে তুলে নিল, তারপর চললো লম্বা লম্বা পা ফেলে, বন-বাদাড় পাহাড়-পর্বত পার হয়ে।

সাত-সমুদ্দুর তেরো-নদী পার হয়ে সন্ধ্যাবেলা চার বন্ধু এসে পৌঁছালো পাষাণপুরীর ডাইনীবুড়ীর বাড়ী।

ডাইনীবুড়ী দরজায় দাঁড়িয়েছিল, তাদের দেখেই বললো,—আমি তোদের জন্যেই বসে আছি, এসো-এসো, বসো—

রাজপুত্র বললো—আমরা এসেছি ওই রাজকন্যাকে নিয়ে যাব বলে।

ডাইনীবুড়ী বললো—নিয়ে যাব বললেই তো আর আমি ছেড়ে দোব না? তিন রাত্রি রাজকন্যাকে পাহারা দিতে হবে—যদি পার রাজকন্যাকে পাবে, যদি না পার পাষাণ হয়ে যাবে।

—এ তো সামান্য কথা, এখনি—

ডাইনীবুড়ী রাজকন্যাকে তাদের মাঝে বসিয়ে রেখে গেল, বললে—কাল সকালে এসে দেখবো রাজকন্যা আছে কি নেই।

ডাইনীবুড়ী চলে গেলে, চার বন্ধু ঘরের চার কোণে বসে রইল রাজকন্যাকে ঘিরে। রাজকন্যার মুখে কোন কথা নেই, চোখে শুধু জল।

বসে বসে চার বন্ধু কখন্ যে ঘুমিয়ে পড়েছে খেয়াল নেই। ভোর বেলা সবার আগে ঘুম ভেঙেছে রাজকুমারের। দেখে, রাজকন্যা নেই। তাড়াতাড়ি তিন বন্ধুকে ডাকলো, বললো—এখন করি কি?

—চিন্তার কোন কারণ নেই, রাজকন্যা কোথায় গেছে আমি

দেখছি—বলে ভস্মলোচন তীক্ষ্ণ চোখে একবার তাকালো জানালার বাইরে। তারপর বললো—এখান থেকে তিনশো যোজন দূরে এক নারিকেল গাছে একটি নারিকেলের ভিতর রাজকন্যা লুকিয়ে আছে।

—চলো নিয়ে আসি—বলে দীর্ঘপদ ভস্মলোচনকে কাঁধে করলো, তারপর বনবাদাড় পার হয়ে তিন মিনিটে সেই নারিকেলটি পেড়ে আনলো।

সকালে ডাইনীবুড়ী এসে বললো—কই, রাজকন্যা কোথায়?

—এই নারিকেলের মধ্যে আছে—বলে রাজপুত্র এক আছাড়ে নারিকেলটি ভেঙে ফেললো। রাজকন্যা বেরিয়ে এলো নারিকেলের ভিতর থেকে। ডাইনীবুড়ীর মুখখানি পোড়া হাঁড়ির মত কালো হয়ে গেল।

সারাদিন চার বন্ধু পাষাণপুরীতে ঘুরে বেড়ালো। ডাইনীর মন্ত্রে যেখানে যে ছিল সব পাষাণ হয়ে গেছে—কত গরু-ঘোড়া, কুকুর-বেড়াল, রাজা-মন্ত্রী, সিপাই-সান্ত্রী সব পাথর আর পাথর।

সন্ধ্যাবেলা ডাইনীবুড়ী রাজকন্যাকে রেখে গেল।

চার বন্ধু ঘরের চার দরজায় পাহারা দিতে বসলো। বসে বসে আবার কখন্ তারা ঘুমিয়ে পড়েছে। সকালবেলা ঘুম ভাঙতেই রাজপুত্র চমকে উঠলো—তাইতো, রাজকন্যা নেই।

তিন বন্ধুকে ডেকে বললো—দেখ, রাজকন্যা কোথায় গেল।

ভস্মলোচন জানালা দিয়ে বাইরের পানে তাকালো, বললো—

দেখতে পেয়েছি, এখান থেকে ছ'শো যোজন দূরে এক পাহাড়ের ভিতর রাজকন্যা লুকিয়ে আছে।

—চলো দেখি—বলে দীর্ঘপদ ভস্মলোচনকে কাঁধে তুলে নিল।

লম্বা লম্বা পা ফেলে ছ'মিনিটে ছ'শো যোজন পথ পার হয়ে দীর্ঘপদ এলো পাহাড়ের সাম্‌নে। ভস্মলোচন কট্‌মট্ করে তাকালো, পাহাড়ে আগুন ধরে গেল। দেখতে দেখতে সব পাহাড়টাই পুড়ে ছাই হয়ে গেল, ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো রাজকন্যা।

রাজকন্যাকে নিয়ে তারা ঘরে ফিরেছে, এমন সময় ডাইনীবুড়ী এসে দাঁড়ালো। রাজকন্যাকে দেখে তার মুখে আর কথা জোগালো না, বললো—এখনও একরাত বাকী! আজ রাতে যদি রাজকন্যাকে ঠিক মত পাহারা দিতে পার, তাহলে তোমরাই জিতবে।

সেই রাতে রাজকন্যাকে পাহারা দিতে দিতে আগের দু'রাতের মতই চারবন্ধু ঠিক ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুম ভাঙতেই রাজপুত্র চমকে উঠলো—রাজকন্যা নেই।

তিনবন্ধুকে ডেকে তুলতেই, ভস্মলোচন জানালা দিয়ে তাকালো বাইরের পানে, বললো—দেখতে পেয়েছি, এখান থেকে ন'শো যোজন দূরে এক সাগরের নিচে একটি ঝিনুকের ভিতর রাজকন্যা লুকিয়ে আছে।

—চলো দেখি—বলে দীর্ঘপদ, ভস্মলোচন ও লম্বোদরকে কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। ন'শো যোজন পথ ন'মিনিটে পার হয়ে সাগরের পারে এসে পৌঁছালো। ঝিনুককে বের করবে কেমন করে? অতো জলের নিচে হাত পৌঁছাবে কার? লম্বোদর বললো—কিছুই করতে হবে না, আমি সাগর শুষে নিচ্ছি।

লম্বোদর সাগর শুষে নিল, বিরাট পেটটা ফুলে পাহাড়ের মত হয়ে গেল। ভস্মলোচন তুলে নিল ঝিনুকটি।

এদিকে রাজকুমার একা ঘরে বসে আছে, ডাইনীবুড়ী এসে বললো—কি গো, কোথায় গেল রাজকন্যে ?

রাজকুমার বললো—আমার তিনবন্ধুর সঙ্গে রাজকন্যা সাগর পারে বেড়াতে গেছে, এখনি ফিরবে।

—সাগরপারে বেড়াতে গেছে, সাগর কি এখানে ?—বলে ডাইনীবুড়ী হা-হা করে হেসে উঠলো। রাজপুত্রের মনে হোল তার দেহ যেন পাথরের মত কঠিন হয়ে আসছে।

ভস্মলোচন দূর থেকে সব দেখতে পাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় সে ঘরের মধ্যে ঝিনুকটি ছুঁড়ে দিল। মাটিতে পড়েই ঝিনুকটা ভেঙে গেল, রাজকন্যা বেরিয়ে পড়লো তার ভিতর থেকে।

ডাইনীবুড়ী চম্‌কে উঠলো। চোখের নিমেষে একটা কালো কাক হয়ে কা-কা করতে করতে সে উড়ে গেল আকাশে। সঙ্গে সঙ্গে পাষাণপুরীর যে-যেখানে পাষাণ হয়ে ছিল সবাই বেঁচে উঠলো—সারা নগরে আবার জেগে উঠলো প্রাণের সাড়া,—মানুষের ভীড়—জমজমাট, কলরব, সোরগোল।

অনেক ধুম্‌ধাম্ করে রাজপুত্রের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হয়ে গেল। রাজপুত্র ক'নে নিয়ে দেশে ফিরলো। বুড়ো রাজা ছেলে-বউকে সিংহাসনে বসিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। চার বন্ধুতে পরম সুখে দিন কাটাতে লাগলো।

আমার কথাটিও ফুরুলো...

চাঁদের বুড়ী

এক ছিল রাজা।

একদিন রাজা রাজসভায় বসে আছেন, এমন সময় যত জেলে এসে বললো—মহারাজ, এভাবে আর তো চলে না, আমরা তো মরতে বসেছি। সাগরে যখনই জাল ফেলি, মাছ আর ওঠে না, জালের যত দড়ি কে কেটে দেয়। আমরা তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি এর একটা বিহিত না করলে তো আমরা মারা যাই, মহারাজ!

রাজা বললেন—তোমরা জলে নেমে দেখেছ কিছু?

—সাহস হয় না মহারাজ, যদি কোন বড় হাঙ্গর কুমীর হয়!

—ঠিক কথা, কিন্তু তাহলে?—রাজা ভ্রূ কুঁচকে কি যেন খানিক ভাবলেন, তারপর বললেন—ডাকো ডাইনী বুড়ীকে, সে খড়ি পেতে গুনে বলুক কি আছে সাগরের জলে।

ডাইনী বুড়ী এলো। সব শুনলো, মাটিতে খড়ির আঁচড় দিয়ে

কত কি হিজিবিজি আঁকলো, তারপর বললো—ও কোন জানোয়ার নয়, সাগরপুরীর রাজকন্যা।

—আমার প্রজাদের যে ক্ষতি করছে, কি করে তা বন্ধ হয়?

ডাইনী বললো—মহারাজ, ও মেয়েটিকে ধরতে না পারলে জালকাটা বন্ধ হবে না।

রাজা বললেন—বেশ, তিনদিন সময় দিলাম, এর একটা উপায় করে দাও।

ডাইনী বললো—দেখি।

সাগররাজ্যের রাজকন্যা ঝিনুকের বুকে শুয়ে শুয়ে দেখে: জেলেদের বড় বড় জাল সাগরের যত মাছ ধরে নিয়ে যায়। মাছেরা জালের মাঝে লাফালাফি করে রাজকন্যার মুখের পানে তাকিয়ে কাঁদে, বলে—বাঁচাও! রাজকন্যা সইতে পারে না, ছুটে এসে জালের দড়িগুলো কেটে দেয়। মাছগুলো লাফাতে লাফাতে আবার সাগরের বুকে ছিটকে পড়ে।

জেলেরা নিত্য নতুন জাল ফেলে,রাজকন্যা রোজই জাল কেটে দেয়।

সেদিন জাল কাটতে গিয়ে সাগরকন্যা দেখে জাল তো নেই, একটা স্থন্দর পুতুল ঝুলছে। ভারী মজার ব্যাপার তো! পুতুলটি নেড়ে-চেড়ে রাজকন্যা দেখে।

কিন্তু হঠাৎ জালের বদলে পুতুল কেন? রাজকন্যা ভেসে ওঠে ব্যাপার কি দেখবার জন্য। সারি সারি নৌকায় সব পুতুল সাজানো, —কত রকমের পুতুল, কত রংচং! সাগরকন্যার বেশ লাগে দেখতে। একখানির পর একখানি নৌকা দেখতে দেখতে সে এগিয়ে যায়। যতই দেখে ততই মনে হয় পরেরটি যেন আগের চেয়ে আরও ভালো, আরও বেশী ঝল্‌মলে।

নৌকার সারি শেষ হয়ে সুরু হয় জমি। জমির উপরেও সারি সারি পুতুল সাজানো। সাগরকন্যা পুতুল দেখার লোভ সামলাতে পারলো না, ডাঙ্গায় এসে উঠলো। যতই দেখে ততই মনে হয় পরের পুতুলগুলো যেন আগের চেয়ে বেশী ঝিকমিকে। দেখতে দেখতে হাঁটতে হাঁটতে রাজকন্যার পায়ে ব্যথা ধরে, এমন ভাবে কখনও সে হাঁটে নি, এক গাছতলায় এসে সে বসে পড়লো।

ডাইনী এতক্ষণ তার পিছু-পিছু আসছিল, রূপার কাঠি ছুঁইয়ে এবার সে রাজকন্যাকে ঘুম পাড়িয়ে দিল। রাজার লোক পাল্‌কী করে সাগরকন্যাকে নিয়ে গেল রাজবাড়ীতে।

সাগরকন্যারঘুম ভাঙতেই সে অবাক হয়ে গেল ঃ সোনার পালঙ্কে শুয়ে আছে, চারিপাশের দেওয়ালে মণি-মুক্তা হীরা-জহরতের কাজ। সামনে রাজা দাঁড়িয়েছিল, রাজকন্যা বললো—আমি কোথায় ?

—তুমি আমার বাড়ীতে, আমি এখানকার রাজা।

—আমাকে এখানে আনলে কেন ?

—আমি এনেছি, তোমাকে আমি রাণী করবো।

—কিন্তু আমি যে সাগরের মেয়ে, জলে থাকতে ভালবাসি।

—তা হোক, জলে তোমার এমন নীল আকাশ, এমন মেঘের মত পাহাড়, এতো রঙীন ফুল, এতো মিষ্টি ফল আছে ? কত দাসদাসী তোমার কথা শুনবে, কত প্রজা তোমার হুকুম মানবে,—এ তোমার ভাল লাগে না ?

সাগরকন্যা বললো—বেশ, আমি রাণী হব।

সাগরকন্যা হেনার সঙ্গে হাওয়াই-রাজার বিয়ে হয়ে গেল। রাজা কত হীরা-জহরত মণি-মুক্তার সাজ-পোষাক তৈরী করিয়ে দিল। রাণী বললো—সাগরের নিচে আমার এমন একটা গোলক আছে, যা সারা সমুদ্রের জল ঝল্‌মলে করে রাখে। সেইটি আমি আপনাকে এনে দেব।
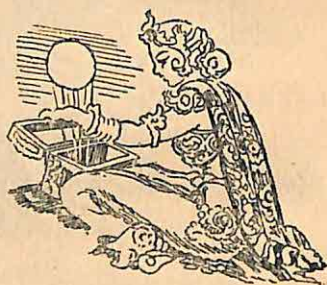
রাত্রে ডুব দিয়ে রাণী সাগরের নিচে থেকে একটা বাক্‌স তুলে আন্‌লো। বাক্‌স খুলতেই বেরুলো রূপালী চাঁদ, রাজা ধরতে গেল—রাজার হাত পিছলে চাঁদ লাফিয়ে লাফিয়ে গিয়ে উঠলো আকাশের গায়। এতদিন আকাশে শুধু তারা ছিল, চাঁদকে পেয়ে সারা আকাশ আলোয় আলো হয়ে গেল।

এদিকে সাগরের নিচে অন্ধকার হয়ে গেল। সাগরের রাজা চম্‌কে উঠলেন—চাঁদ কোথায় গেল ?

মাছেরা বলে দিল—হেনা চাঁদকে চুরী করে নিয়ে গেছে।

সাগরের রাজা ক্ষেপে উঠলেন, সাগরের পার থেকে ডেকে বললেন—হেনা, আমার চাঁদ আমাকে ফিরে দাও।

হেনা বললো—কি করে দোব, চাঁদতো আকাশে।

সাগররাজার যত রাগ গিয়ে পড়লো হেনার উপর। সাগর ফুলে উঠলো, ফুঁসে উঠলো, বড় বড় ঢেউ নিয়ে ছুটে এলো—তুফানে ধুয়ে দিলে হাওয়াই রাজ্য। সারা দেশে বাড়ী-ঘর পশু-পাখী কিছুই আর রইল না। শুধু যে ক'জন মানুষ পাহাড়ের উপরে ছিল, তারাই বেঁচে গেল।

রাজার ভারী দুঃখ হোল। চাঁদতো আমি চাইনি, হেনা কেন চাঁদকে চুরী করে আনলো সাগরের নিচে থেকে ? সেই পাপেই তো আমার রাজ্য ছারখার হয়ে গেল।

রাজার যত রাগ গিয়ে পড়লো হেনার উপর। ঘর-সংসারের যত কাজ দিল তাকে করতে। দিনরাত যত রাজ্যের কাজ করতে করতে হেনার দেহ ভেঙ্গে পড়লো, মনে আর সুখ রইল না। ইচ্ছা হোল-সেখান থেকে চলে যায়, কিন্তু চারিপাশে সাগর। সাগরের বুকে একবার পা বাড়ালেই আর রক্ষা নেই, সাগরের রাজা ধরে নিয়ে যাবে। বেচারা যায় কোথায় ? দিনরাত কাজ করে আর কাঁদে, চোখের জল মোছে আর কাজ করে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা দেখে চাঁদের পাশ দিয়ে এক রামধনু নেমে এসেছে হাওয়াই দ্বীপের বুকে। চাঁদ তার দুঃখ দেখে পথ করে

দিয়েছে তার দেশে পালিয়ে যাবার জন্য। রামধনুর উপর দিয়ে হেনা ছুটলো চাঁদের দেশে।

রাজা দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি ধরতে এলো, কিন্তু ধরতে পারলো না, রাজার হাত পিছ্‌লে হেনা ছুটলো।

রাজা উঠতে গেল সেই পথে, কিন্তু দু'পা যেতে না যেতেই সূর্য অস্ত গেল, রামধনু মিলিয়ে গেল আকাশের গায়, রাজা মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে গেল মাটির উপর। হেনা তখন চাঁদের দেশে পৌঁছে গেছে।

সেই চাঁদের দেশেই হেনা আছে আজ অবধি। তবে এখন তার বয়স হয়ে গেছে অনেক, লোকে তাই তাকে বলে চাঁদের বুড়ী। তোমরা দেখনি তাকে ? ভালো করে চাঁদের পানে তাকিয়ে দেখো, চাঁদের গায়ে দেখতে পাবে তার ছায়া।—

চাঁদের মা বুড়ী
চাঁদে বসে চরকা কাটে,
বুড়ী থুরথুরী !

এস্কিমোদের গল্পকথা

শুকতারা

বরফের পালিশ-করা দেশ, তার উপর আবার ঝির ঝির করে পেঁজা তুলোর মত তুষার পড়ছে। সারা দেশ জুড়ে সাদায় সাদা হয়ে গেছে,—মাথার উপর পায়ের নিচে সব সাদা,—আর যেন কোন রং নেই সারা দেশে। এমন দিনে এক হাঁটু তুষার ঠেলে জমাট-বাঁধা পালিস-করা বরফের উপর দিয়ে পিছ্‌লে চলতে বেশ লাগে। এস্কিমো ছেলেমেয়েরা পিছ্‌লে পিছ্‌লে খেলে বেড়ায়। কখন-বা এসে দাঁড়ায় বরফের কিনারায়, মাঝে মাঝে ফাটল ধরেছে, নিচে নীল জল দেখা যায়, সেই নীল জলে সীল মাছ মুখ তোলে নিঃশ্বাস ফেলার জন্য। ছেলের দল হৈ হৈ করে উঠে, ভয়ে টুপ করে মাথা ডুবিয়ে মাছটা পালিয়ে যায়।

সীল মাছ শিকার করার এখনই সবচেয়ে ভালো সময়। এক একটি ফাটলের মুখে তীক্ষমুখী 'হারপুণ' নিয়ে এক একজন এস্কিমো অপেক্ষা করতে থাকে, যেই সীল মাছ মাথা তোলে অম্‌নি হারপুণ ছুঁড়ে তাকে গেঁথে ফেলে। হারপুণের সঙ্গে বাঁধা থাকে দড়ি, সেই

দাড়ি ধরে সীল মাছটাকে উপরে টেনে তোলে। একটি মাছ মারলে দিন কয়েক ধরে ভালো ভাবেই খাওয়া চলে।

গাঁয়ের খিট্‌খিটে বুড়ো সেদিন বেরিয়েছিল সীল শীকার করতে। তার পিছনে ছেলের দলও ছিল শীকারের মজা দেখবার জন্য।

সীল উঠছে আর বুড়ো হারপুণ ছুঁড়ে মারছে, কিন্তু বার বার ফস্‌কে যাচ্ছে। বয়স হয়েছে, বুড়োর হাতে আর তেমন জোর নেই,
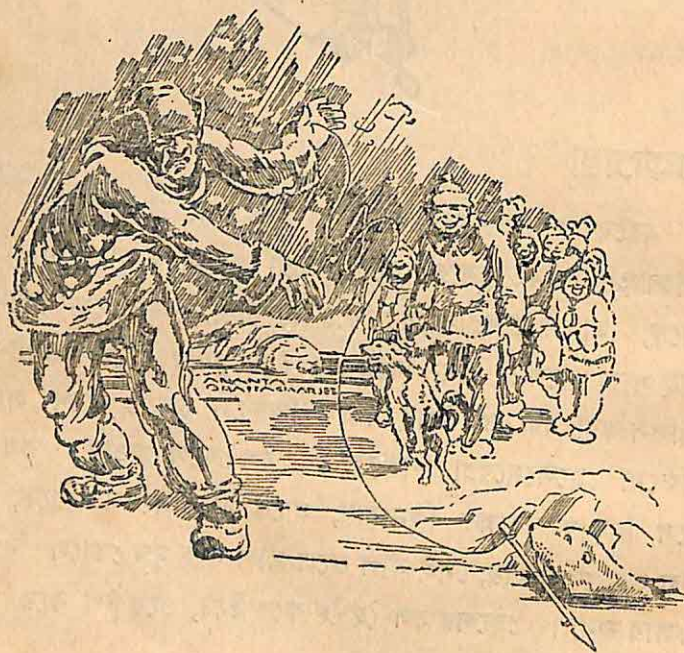
তাই হারপুণ বিঁধছে না। সীল পালিয়ে যাচ্ছে। ছেলের দল মজা পাচ্ছে, হাততালি দিয়ে হৈ চৈ করছে।

খিট্‌খিটে বুড়ো আর সইতে পারে না, তার যত রাগ গিয়ে পড়ে ওই ছেলেদের উপর, মনে মনে বললে—দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি।

তারপর ছেলেমেয়েগুলিকে ভুলিয়ে নিয়ে এলো পাহাড়ের এক গুহায়, তাদের ভিতরে ঢুকিয়ে গুহার মুখটা সে বন্ধ করে দিল।

অন্ধকার গুহার মধ্যে ছেলেমেয়েদের মুখের হাসি এক নিমেষে মিলিয়ে গেল, কি যে করবে তারা তো ভেবেই পেলে না। কত কাকুতি-মিনতি করলো, শেষে বাইরে থেকে কোন সাড়াই যখন পেলে না, তখন সবাই মিলে কান্না জুড়ে দিলে।

কিন্তু সেখানে তাদের কান্না শুনবে কে? সে শব্দ পাথরের গায় ধাক্কা লেগে ফিরে এলো,—সারা গুহা গম্‌গম্‌ করে উঠলো। ছেলেরা ভয় পেয়ে গেল, আরো জোরে সুরু করে দিল কান্না।

গুহার মাথায় একটি ফুকর ছিল। সেই ফুকর দিয়ে শব্দটা বাইরে গেল। পাখীর ঝাঁক উড়তে উড়তে শুনতে পেলে সেই কান্না। মাঝে মাঝে দু'এক টুকরো খাবার এনে তারা ফেলে দিতে লাগলো গুহার ভিতরে। তাই খেয়ে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা বসে বসে ভাবতে লাগলো কি করবে।

শেষে কোন কিছু ভেবে ঠিক কর্‌তে না পেরে তারা ভগবানকে ডাকতে সুরু করে দিলে। তাদের কাকুতি শুনে পরীরা এলো। পাথর সরিয়ে ছেলে-মেয়েদেরকে তারা গুহার বাইরে নিয়ে এলো।

এদিকে তাদের বাপ-মায়েরা খুঁজতে বেড়িয়েছে, চারিপাশ তোলপাড় করছে—ছেলেমেয়েরা গেল কোথায়? যতদূর পারে তারা ঘুরে এলো, কিন্তু ছেলেমেয়েরা কই?

সকলে যখন হতাশ হয়ে পড়েছে, এমন সময় কে-একজন এসে খবর দিলে—ওরা ফিরেছে।

ফিরেছে!—সবাই ছুটে এলো, জিজ্ঞাসা করলো—কোথায় ছিলি রে?

—আমাদেরকে বন্ধ করে রেখেছিল।

—কে ?

—খিট্‌খিটে বুড়ো।

ছেলেরা সব কথা বললো।

আর যায় কোথায়! হাতের কাছে যে যা পেলে তাই নিয়ে ছুটলো বুড়োকে মারতে। খিট্‌খিটে বুড়ো তাই না দেখে দিল দৌড়। দৌড়াতে দৌড়াতে শেষে গাঁ ছাড়িয়ে চলে গেল। গাঁয়ের লোকেরা তবু ছাড়ে না, ছুরী-ছোরা-বল্লম এসে পড়তে লাগলো চারিপাশে।

বেচারা কি করবে ভেবে পেলে না। বুড়ো মানুষ কত আর দৌড়াবে। গাঁয়ের লোকেরা শেষে তাকে ধরে ফেলে আর কি। পরীরা এতক্ষণ মজা দেখছিল। লোকগুলির হাতে বুড়ো নেহাৎ মারা যায় দেখে এবার তাদের দয়া হোল। বুড়োকে তারা তুলে নিলে শূন্যে। এতটা উপরে তুলে নিলে যেখানে বর্শা বল্লম তীর কিছুই তাকে ছুঁতে পারবে না।

সে দিন থেকে বুড়ো আকাশেই রয়ে গেল, কিন্তু চোখ রইল নিচের দিকে,—ভয়ে-ভয়ে নিজের গাঁয়ের লোকদের দিকেই সে তাকিয়ে আছে আজ অবধি।

সেই খিট্‌খিটে বুড়োটি কে জান ?—আকাশের ওই শুকতারা।

যাদুকরের গল্প :

যাদু-ঘর

অনেক—অনেক দিন আগের কথা। এক যাদুকর এলো দেশে, তৈরী করলো এক প্রকাণ্ড বাড়ী—মাটীর উপর নয়,—আকাশের গায়, হাওয়ার বুকে।

দেশসুদ্ধ লোক তো অবাক, হাঁ করে তাকিয়ে থাকে আকাশের পানে, হাওয়াই-বাড়ীর পানে। রাজা দেখে, মন্ত্রী দেখে, রাজপুত্র রাজকন্যা দেখে, সেনাপতি কোটাল পাত্র-মিত্র সবাই তাকিয়ে থাকে হাঁ করে।

যাদুকর একলা থাকে সেই বাড়ীতে, বারান্দা থেকে নিচের লোকগুলির পানে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে আর হাসে।

একদিন যাদুকরের কি খেয়াল হোল, টুপ্ করে রাজকন্যাকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেল নিজের বাড়ীতে।

রাজ্যময় হৈ চৈ পড়ে গেল। রাজা বললেন—যেমন করে পার, আমার মেয়েকে উদ্ধার কর—যাদুকরকে ধরে আনো!

সেনাপতি আদেশ দিলেন সৈন্যদেরকে।

সৈন্যরা বড় বড় মই তৈরী করলো।

কিন্তু মই যত উঁচু হয়, যাদুকরের হাওয়াই-বাড়ী ততই উঁচুতে ওঠে। কোন মই কোন মতেই হাওয়াই-বাড়ী অবধি পৌঁছায় না।

সেনাপতি আর কি করবেন ভেবে পান না। রাজা তাকিয়ে থাকেন আকাশের পানে, মন্ত্রী সাদা দাড়ীতে সুড়সুড়ি দেন।

শেষে রাজা একদিন বললেন—যে ওই যাদুকরের হাত থেকে আমার মেয়েকে ফিরিয়ে আনতে পারবে তাকে দোব অর্ধেক রাজত্ব আর ওই রাজকন্যা।

কিন্তু ওই হাওয়াই বাড়ীতে কি করে যে পৌঁছাবে, তা কেউ ভেবে পেলে না, কি করে যে যাদুকরের যাদু-ঘর থেকে রাজকন্যাকে ফিরিয়ে আনবে তাও কেউ বুঝলো না।

সবাই ভাবে আর ভাবে।

অনেক ভেবে-চিন্তে এক চাষার ছেলে একদিন তীর-ধনুক নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। একটা লম্বা দড়ির খুঁট তীরে বেঁধে ছুঁড়ে দিলে যাদুকরের বাড়ীর পানে। তীরটি এসে বিঁধলো হাওয়াই-বাড়ীর কাঠের দরজার গায়। ধারালো তীর শক্ত হয়েই বিঁধলো। সেই দড়ি ধরে চাষার ছেলে উঠে এলো হাওয়াই-ঘরে।

বন্ধ দরজায় চাষার ছেলে ধাক্কা দিল—খট্ খট্ খট্!

—কে কে কে?—যাদুকর বেরিয়ে এলো দরজা খুলে।

চাষার ছেলে তলোয়ারের এক কোপে যাদুকরকে শেষ করে দিলে, তারপর রাজকন্যাকে খুঁজে বের করলো সেই বাড়ীর ভিতর থেকে।

কিন্তু রাজকন্যা নিচে নামবে কেমন করে! বললো—নিচের দিকে চাইলেই তো আমার মাথা ঘুরে যাচ্ছে, ওই দড়ি ধরে নামতে আমি পারবো না, পড়ে যাব!

তাহলে ?—শেষে চাষার ছেলে রাজকন্যার কোমরে দড়ি বেঁধে নিচে ঝুলিয়ে দিলে।

এক বেদের ছেলে এতক্ষণ নিচে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল, রাজকন্যা নিচে নামতেই সে দড়িটায় আগুন ধরিয়ে দিলে। তারপর রাজকন্যার হাত ধরে এসে দাঁড়ালো রাজসভায়, বললো—মহারাজ, আমি আমার এক চাকরকে সঙ্গে নিয়ে, যাদুকরের হাওয়াই-ঘরে গিয়েছিলাম, যাদুকরকে মেরে রাজকন্যাকে উদ্ধার করে এনেছি।

রাজা ভারী খুসি হলেন, বললেন—বেশ, বেশ, অর্ধেক রাজ্য আর এই রাজকন্যা তোমার হাতে দিলাম।

রাজ্যময় রাজকন্যার বিয়ের উৎসব লেগে গেল।

ওদিকে হাওয়াই-ঘর থেকে চাষার ছেলে আর নামতে পারে না। বেদের ছেলে দড়িটি পুড়িয়ে দিয়ে গেছে, আরেকটা দড়ি চাই। এ ঘরে খোঁজে, ও ঘরে খোঁজে, বাড়ীময় সে দড়ি খুঁজে বেড়ায়। খুঁজতে খুঁজতে এক ঘরে এসে দেখে ঘরভরা কলকব্জা, যন্তর-মন্তর।

এতো কলকব্জা এই হাওয়াই-ঘরে কোন্ কাজে লাগে ? চাষার ছেলে সেই যন্তর-মন্তরগুলো একবার নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলো। এটা নাড়ে, ওটা নাড়ে, এটা বাঁকায়, ওটা ঘোরায়। কল চলছে, বাড়ী নড়ছে। জানালা দিয়ে দেখেঃ বাড়ী উঠছে, নামছে, নড়ছে, হেল্‌ছে, দুলছে, এদিকে চলছে, ওদিকে চলছে। চাষার ছেলে একটি একটি করে কল চালাতে শিখে নিলে, তারপর হাওয়াই-ঘরটাকে উড়িয়ে নিয়ে চললো রাজবাড়ীর দিকে।

এদিকে সেদিন রাজকন্যার বিয়ে। চারিদিকে ঢাক ঢোল নহবৎ বাজছে। হৈহৈ রৈরৈ। দেশসুদ্ধ লোকের নেমন্তন্ন হয়েছে।

রাজবাড়ীতে। বেদের ছেলে বর সেজে এসে বসেছে সিংহাসনে। রাজসভা জম্-জমাট।

এমন সময় হাওয়াই-ঘরটি উড়ে এলো মাথার উপর। সবাই চমকে উঠলো,—যাদুকর আবার বেঁচে উঠলো নাকি? সবাই ভয় পেল।

বাড়ীটি নিচে নামতে লাগলো, এবার বুঝি সবসুদ্ধ চাপা দেবে! প্রাণের ভয়ে কে কোন্‌দিকে যাবে ভেবে পেলে না। সভার মাঝে সাড়া পড়ে গেল—গোলমাল, হুড়োহুড়ি।

বেদের ছেলে চোখ তুলে দেখে মাথার উপর হাওয়াই-ঘর, হাওয়াই-ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে চাষার ছেলে। আর যায় কোথা! বেদের ছেলে সিংহাসন ফেলে দৌড় দিলে।

হাওয়াই-ঘর নিচে নামলো, চাষার ছেলে নিচে নামলো, রাজা বললেন—কে? তুমি কে?

—আজ্ঞে মহারাজ, আমিই যাদুকরকে মেরেছি, আমিই উদ্ধার করেছি রাজকন্যাকে।

রাজা বললেন—সত্যি কথা?

রাজকন্যা বললো—সত্যি কথা।

রাজা বললেন—বেশ, তাহলে তোমারই সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হোক্।

আবার নহবৎ বসলো, ঢাক ঢোক সানাই বাজলো, চাষার ছেলের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে হয়ে গেল।

অর্ধেক রাজ্যের রাজা হয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে চাষার ছেলের দিন কাটতে লাগলো।

আমার কথাটিও ফুরুলো।—
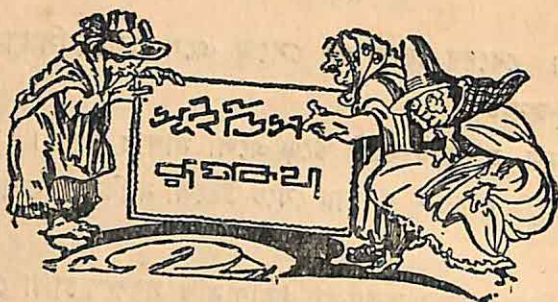
সোনার সুতো

এক ছিল রাজকন্যা॥ যেমনি ছিল তার রূপ তেমনি ছিল তার গুণ।

রাজকন্যা গান গায়, যে শোনে সেই বলে—চমৎকার!

রাজকন্যা নাচে, যে দেখে সে আর ভুলতে পারে না।

লোকের মুখে মুখে রাজকন্যার গুণের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো নানা দেশে। ভিন্ দেশের এক রাজপুত্র এলো রাজকন্যার গান শুনতে, নাচ দেখতে। ভারী ভাল লাগলো তার। ফিরে গিয়ে বললো—মা, ওই মেয়েকে আমি বিয়ে করবো—ভারী সুন্দর গান করে।

রাণীমা বললেন—গান তো করে কিন্তু কাজ করতে পারে তো? সেলাই করা? রান্না করা?

—নাচতে পারে চমৎকার।

—কিন্তু নাচ-গান করলো তো আর পেট ভরবে না। জল তুলতে পারবে? বাসন মাজতে পারবে?

রাজপুত্র বললো—সে কথা তো জিজ্ঞাসা করিনি।

রাণীমা বললেন—বেশ, রাজকন্যাকে নিয়ে এসো আমার কাছে। আমি আগে দেখি।

রাজপুত্র ছুটলো রাজকন্যাকে আনতে।

রাজকন্যা আসতেই রাণীমা বললেন—তোমার গুণের কথা অনেক শুনেছি, তুমি কেমন কাজের লোক তাই এবার দেখবো।

সেরখানেক তুলো আর প্রকাণ্ড একটা চরকা দিয়ে রাণীমা রাজকন্যাকে বসিয়ে দিলেন এক ঘরে, বললেন—কাল সকাল হবার আগেই এই সব তুলোর সুতো কেটে রাখবে, আমি এসে দেখবো।

বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে রাণীমা চলে গেলেন।

রাজকন্যার মাথায় ত আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। জীবনে কোন দিন সে সুতা কাটেনি, কি করে চরকা চালাতে হয় তাও জানে না। আর এই এতো তুলো একরাত্রে কেটে শেষ করতে হবে! রাজকন্যা কি করবে ভেবে পেলে না, তার চোখে জল এলো।

রাজকন্যা বসে বসে কাঁদে, দিনের আলো ঝাপ্‌সা হয়ে আসে।

এমন সময় টক্ টক্ টক্—কে যেন জানালায় ধাক্কা দিল। রাজকন্যা ঠিক ঠাহর করতে পারলো না। আবার শোনা গেল—ঠক্ ঠক্ ঠক্। রাজকন্যা এবার জানালা খুলে দিলে। থুপ্ থুপ্ করে ভিতরে এসে ঢুকলো এক বুড়ী। তার দেহটা যেমন বেঁটে, পা ছু'খানি তেমনি মোটা। রাজকন্যা তো থ'।

বুড়ী বললো—নমস্কার রাজকন্যে।

রাজকন্যার মুখে কোন কথা জোগালো না।

বুড়ী আবার বললো—নমস্কার রাজকন্যে।

রাজকন্যা কোন রকমে এবার বললো—নমস্কার।

বুড়ী বললো—আমি তোমাকে ভয় দেখাতে আসিনি রাজকন্যে, আমার নাম 'গোদা-পা'। তুমি কেন কাঁদছ তাই জানতে এলাম।

—এই এতো তুলো আজ রাত্তিরে সুতো কেটে শেষ করতে হবে

রাণীমা বলেছেন সকালে এসেই দেখবেন। আমি তো জানি না কি করে সুতো কাটতে হয়।
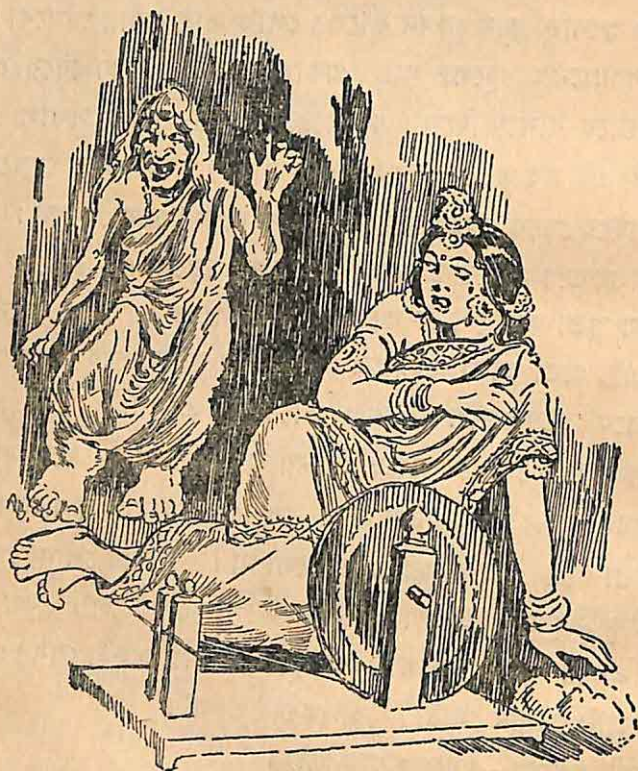
—তার জন্যে দুঃখ কি রাজকন্যে, আমি এখনি সব সুতো কেটে দিচ্ছি। তবে একটা কথা আছে।

—কি কথা ?

—আমার সঙ্গে তোমাকে 'সই' পাতাতে হবে, আর তোমার বিয়ের দিন আমাকে নেমন্তন্ন করতে হবে।

—বেশ, করবো।

—ঠিক ?

—ঠিক।

গোদা-পা বুড়ী পা ছড়িয়ে তুলো পিঁজতে বসলো। তারপরেই চরকা চললো ঘর-ঘর করে। মাকড়সার জালের মতো সরু স্থতো কাটা হতে লাগলো। রাজকন্যা বসে বসে দেখতে লাগলো, দেখতে দেখতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়লো।

সকাল বেলা দরজা খোলার শব্দে রাজকন্যার ঘুম ভেঙ্গে গেল। রাণীমা ঘরে ঢুকেই তো অবাক—স্থতোর নুটি চরকার পাশে সাজানো রয়েছে। অমন মিহি স্থতো দেখে তিনি ভারী খুসী হলেন। বললেন—বাঃ, বেশতো স্থতো কেটেছ। কিন্তু এবার তো আর এক কাজ করতে হবে রাজকন্যা। এই স্থতো দিয়ে আজ রাত্রে তোমাকে একখানি কাপড় বুনে রাখতে হবে। পাশের ঘরে তাঁত আছে।

তাঁতের ঘরে রাজকন্যাকে রেখে রাণীমা দরজা বন্ধ করে চলে গেলেন। রাজকন্যার মাথায় আবার যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। বেচারা জীবনে কখনও কাপড় বোনেনি, কি করবে ভেবে পেলে না। চুপ করে ঘরের কোণে বসে রইল।

সারাটা দিন সেইভাবেই কাটলো। সন্ধ্যাবেলায় আবার সেই জানালায় খুট্ খুট্ শব্দ। জানালা খুলে দিতেই ভিতরে এসে ঢুকলো একবুড়ী, বললো—নমস্কার রাজকন্যে।

এবার রাজকন্যা আর চম্‌কালো না, বললো—নমস্কার।

বেঁটে ছোট্ট মানুষটি, হাত তু'খানি গোদা-গোদা, বললো—আমার নাম 'হাতী-হাত', আমি এসেছি তোমার কাপড় বুনে দিতে। তবে একটা কথা আছে বাপু।

—কি কথা ?

—আমার সঙ্গে 'সই' পাতাতে হবে আর তোমার বিয়েতে আমাকে নেমন্তন্ন করতে হবে।

—বেশ, করবো।

হাতী-হাত খুসী হয়ে তার মোটা-মোটা হাত দিয়ে তাঁত চালাতে সুরু করে দিলে।

সারারাত ধরে তাঁত চললো—ঘটাং ঘট্ খটাং খট্। কাপড় বোনা চললো সারা রাত। রাজকন্যা অতো জেগে থাকতে পারলো না, বসে বসে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুম যখন ভাঙলো, বুড়ী তখন চলে গেছে। কিন্তু রাজকন্যার মাথার কাছে রেখে গেছে চমৎকার ফিন্‌ফিনে পালকের মত একখানি কাপড়।

সকালে দরজা খুলেই রাণীমা জিজ্ঞাসা করলেন—কই রাজকন্যা, কাপড় বোনা হয়েছে ?

রাজকন্যা কাপড়খানি এগিয়ে ধরলো।

কাপড় দেখে রাণীমা নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলেন না, এমন কাপড় অনেক তাঁতীও বুনতে পারে না। অনেকক্ষণ ধরে রাণীমা কাপড়খানি নেড়ে-চেড়ে দেখলেন, তারপর বললেন—চমৎকার কাপড় বোনা হয়েছে। কিন্তু এখনো তো আর একটা কাজ বাকী। এই কাপড় দিয়ে রাজপুত্রের জন্য একটা জামা সেলাই করে দিতে হবে। জামার কোনো মাপ দোব না রাজপুত্রকে তুমি দেখেছ, সেই মত জামার মাপ মনে মনে ঠিক করে নেবে। তা বলে জামা ঢিলে হলে চলবে না, ঠিক-ঠিক হওয়া চাই। আজ সারারাত বসে তৈরী কর, কাল সকালে আমি দেখবো।

আবার দরজায় তালা দিয়ে রাণীমা চলে গেলেন।

রাজকন্যা কোনো দিন জামা সেলাই করেনি, জামা সেলাই করতে

জানেও না। তবে আজ আর সে খুব বেশী ভাবনা-চিন্তা করলো না। জানালা খুলে পথের পানে চেয়ে বসে রইলো। দু'দিন যখন দু'বুড়ী এসেছে, তখন আজও নিশ্চয়ই আর এক বুড়ী আসবে।

সন্ধ্যাবেলা সত্যই আর এক বুড়ী এলো। ছোট্ট বেঁটে মানুষটি, কিন্তু চোখ দু'টি ড্যাব্ ড্যাব্ করছে, চোখাচোখি করতে ভয় করে।

বুড়ী বললো—নমস্কার রাজকন্যে।

—নমস্কার।

বুড়ী বললো—আমার নাম 'ড্যাব্‌রা-চোখো'। এসেছি তোমার জামাটা তৈরী করে দিতে। কিন্তু একটা কথা আছে।

—কি কথা ?

—আমার সঙ্গে 'সই' পাতাতে হবে, আর তোমার বিয়ের দিন আমাকে নেমন্তন্ন করতে হবে। রাজকন্যা বললো—বেশ, তাই হবে।

—তাহলে তুমি এখন ঘুমোও, আমি জামা তৈরী করি—বলে রাজকন্যাকে ঘুম পাড়িয়ে বুড়ী জামা সেলাই করতে বস্‌লো।

সকাল বেলা ঘুম ভাঙতেই রাজকন্যা দেখলো জামা তৈরী হয়ে আছে। রাণীমা আসতেই রাজকন্যা জামা তুলে দিল তাঁর হাতে। রাণীমা তখনই রাজপুত্রকে ডেকে পাঠালেন, জামা পরিয়ে দেখলেন—সুন্দর মানিয়েছে। রাণীমা এবার ভারী খুসী হলেন, বললেন—এ মেয়ে আমার খুব পছন্দ হয়েছে, এর সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিতে আমি রাজি আছি।

রাজ্যময় আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল—রাজপুত্রের সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে। দেশ জুড়ে কত জাঁকজমক, কত লোকজন, কত বাজনা-বাদ্যি, কত আলোর জৌলুস।

বিয়ের দিন তিন বুড়ী এলো নেমন্তন্ন খেতে। বাড়ী সুদ্ধ লোক

তাদের দেখে তো অবাক। রাজা বললেন—তোমরা কে গো? কোথা থেকে আস্ছ?

রাজকন্যা বললেন—এরা আমার সই।

—অদ্ভুত চেহারা তো!—রাজা বললেন।

প্রথম বুড়ী বললো—ছেলেবেলায় আমাদের চেহারা ভালো ছিল মহারাজ, দিনরাত ঢেঁকীতে 'পাড়' দিতে দিতে আমার পা দু'খানি এমনি মোটা হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় বুড়ী বললো—ছেলেবেলায় আমারও চেহারা ভালো ছিল মহারাজ, দিন রাত যাঁতা ঘোরাতে ঘোরাতে আমার হাত দু'খানি এমনি মোটা হয়ে গেছে।

তৃতীয় বুড়ী বললো—ছেলেবেলায় আমার চেহারা ভালো ছিল মহারাজ, সেলায়ের কাজে কেবল সূচে সুতো পরাতে পরাতে আমার চোখ দুটো এমনি ড্যাব্‌রা-ড্যাব্‌রা হয়ে গেছে।

রাজা গোদা-পা হাতী-হাত ড্যাব্‌রা-চোখোর পানে আরেকবার ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন। তিন বুড়ী হি হি করে হেসে উঠলো, বললো—বেশী খাটলেই এমনিই হয় মহারাজ, রাজকন্যা যদি দিনরাত খাটে তারও এই দশা হবে।

রাজা তখনই আদেশ দিলেন—আজ থেকে রাজকন্যা কোন কাজ করবে না, কেবল বসে থাকবে!

বুড়ীরা বললো—নাচগান করতে পারে, মহারাজ।

রাজা বললেন—বেশ, কেবল নাচগান করতে পারবে।

রাজার আদেশ, রাজকন্যাকে কোন দিন আর কোন কাজ করতে হোল না। সারাদিনই তার ছুটি। শুধু নেচে আর গেয়ে মনের আনন্দে তার দিন কাটতে লাগলো। আমার কথাটিও ফুরুলো…

দৈত্যের গল্প :

দৈত্যপুরী

এক ছিল সদাগর। জাহাজে চড়ে নানাদেশে সে ঘুড়ে বেড়াতো। দেশে-বিদেশের নানা জিনিষ কেনা-বেচা করাই ছিল তার ব্যবসা।

এক রাতে সাগরের বুকে উঠলো তুমুল ঝড়। সদাগরের জাহাজ পড়লো সেই ঝড়ের মুখে। কিছুতেই জাহাজ আর বাগ্ মানলো না, পিছ্‌লে এসে লাগলো এক চড়ায়।

কোন্ সে দেশ ? কে থাকে সেখানে ?

জাহাজ থেকে সবাই এসে নামলো সেই দেশে।—

ভারী সুন্দর দেশ। চারি পাশে মেঘের মত পাহাড়ের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, ফুল গাছের ঢেউ খেলে গেছে সেই পাহাড়ের কোল অবধি। তারা সেই ফুলের বাগানে বেড়ায় আর ফুল তোলে,—দেখে আর বেড়ায়।

হঠাৎ সেই ফুলগাছের ভিতর থেকে মাথা তুলে দাঁড়ালো এক দৈত্য। সবাই তো চম্‌কে উঠলো, ভয়ে আঁৎকে উঠলো, তারপর ছুট দিল যে যেদিকে পারে—পালা, পালা, পালা— !

সবাই গিয়ে জাহাজে উঠলো, পিছনে পড়ে রইল সদাগর, কেউ তার কথাটা একবারও ভাবলো না।

দৈত্য এসে দাঁড়ালো সদাগরের সামনে। বিরাট-মানুষ, সে-ই তিনতলা সমান উঁচু। চোখ তুলেও তার মুখখানি ভালো করে ঠাহর করা যায় না। সদাগর ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললো—মোরো না গো, আমায় মেরো না!

দৈত্যটি সদাগরকে তুলে ধরলো চোখের সামনে। এমন জানোয়ার সে আর কখনও দেখেনি,—একেবারে থ'। সদাগর তাড়াতাড়ি হাত দুটি জোর করে তাকে একটা নমস্কার করলো।

দৈত্য এবার খুসি হোল, সদাগরকে ভরে নিল পকেটে।

বাড়ী ফিরেই দৈত্য ডাকলো—ওরে খুকী, দেখে যা, আজ কেমন একটা মজার জিনিষ এনেছি মাঠ থেকে।

খুকী ছুটে এলো। সদাগরকে দেখে সে তো অবাক, বললো—ওমা, এ যে জ্যান্ত পুতুল গো!

সদাগর খুকীকে নমস্কার করলো, খুকী তো বেজায় খুসি, বললো—বাবা, আমি নোব!

জ্যান্ত পুতুলটা খুকীই পেল।

খুকী সদাগরকে খেতে দিল এক টুকরো রুটি, আর এক গ্লাস জল। দৈত্যবাড়ীর রুটির টুকরো সবটা সদাগর খেতে পারলো না। আর দৈত্যবাড়ীর জল খাবার গ্লাস—গ্লাস তো নয় যেন একটা পিঁপে—অনেক কষ্টে সদাগর সেটাতে চুমুক দিল। তার হাল-চাল দেখে দৈত্যরা তো হেসে বাঁচে না।

তারপর খুকী সদাগরকে এনে নিজের বিছানায় শুইয়ে দিলে, বললো—ঘুমোও এবার।

খাট তো নয়, একটা ছোট-খাটো মাঠ বললেই হয়। নরম বালিশগুলির ফাঁকে সদাগর হারিয়ে গেল। তারপর ঘুম আর ঘুম।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। সাম্‌নেই প্রকাণ্ড এক জানোয়ার। বাঘের মত চোখ তুলে গন্‌গন্ করছে। এখনি তাকে গিলে খাবে যেন। কোমরে বাঁধা ছিল ছোরা-খানি, টেনে নিয়ে বসিয়ে দিল জানোয়ারটার বুকে। খাটের উপর থেকে জানোয়ারটা লাফিয়ে পড়লো নিচে।

ভীষণ শব্দ! খুকী ছুটে এলো, বললো—কিসের শব্দ

পুতুল-মশাই? একি, এতো রক্ত কেন বিছানায়? কি হোল?

—প্রকাণ্ড একটা জানোয়ার আমাকে খেতে এসেছিল, ভাগ্যে ছোরাখানা কাছে ছিল।

—প্রকাণ্ড একটা জানোয়ার! সে আবার কি গো? ওমা, ও যে একটা নেংটি-ইঁদুর, পুতুল মশাই!

বুকে ছোরা-বেঁধা ইঁদুরটাকে খুকী খাটের নিচে থেকে তুলে ধরলো। চার-পাঁচ হাত লম্বা, দু' তিন হাত উঁচু একটা নেংটি-ইঁদুর! সদাগর বেচারার মুখে আর কথা জোগালো না।

খুকী বললো—যাক গে, তোমার আর এখানে থাকার দরকার নেই, তুমি আমার খেলাঘরে আর সব পুতুলের সঙ্গে থাকবে চল।

খুকী টেবিলের এক টানার মধ্যে সদাগরের থাকার জায়গা করে দিলে, সদাগর সেইখানেই থাকে আর ঘুমোয় আর বেড়ায়, কখন-বা খুকীর সঙ্গে গল্প করে।

৫

দিনগুলো এমনি ভাবেই কাটছিল, হঠাৎ একদিন খুকীর বাবা এসে বললো—আজ হাট-বার, এই জ্যান্ত পুতুলটাকে হাটে নিয়ে যাই, বেশ দু'পয়সা রোজগার হবে।

সদাগরকে এক বাক্সে ভরে দৈত্য হাটে নিয়ে এলো। হাটে ভীড় জমে গেল চারিপাশে। কত লোক এলো সদাগরকে দেখতে। শুধু দৈত্য আর দৈত্য।

দৈত্য বলে—নমস্কার কর!

সদাগর নমস্কার করে।

দৈত্য বলে—তোমার নাম কি?

সদাগর নাম বলে।

সবাই বলে—শুনতে পাচ্ছি নে, চেঁচিয়ে বল।

সদাগর চীৎকার করে। দৈত্যরা দেখে, কথা শোনে, আর হাসে। কতজন কত কথা বলে, যাবার সময় হাসতে হাসতে দিয়ে যায় পয়সা।

সন্ধ্যাবেলা দৈত্যের থলি ভরে যায় পয়সায়। মুখে হাসি ফুটে ওঠে। এদিকে সারাদিন চীৎকার করে সদাগরের গলা ভেঙে যায়। দৈত্য তার কষ্টের কথাটা ভাবে না, দিনের পর দিন চলে হাটের মেলা। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সদাগরকে চীৎকার করতে হয়। বেচারার গলা জ্বালা করে, মাথা টলে। দৈত্য সেদিকে মোটেই নজর দেয় না। থলি ভর্তি করে, পয়সা গুণে গুণে দেখে আর হাসে।

এমনি ভাবেই দিন যায়, একদিন কে-যেন রাণীমার কাছে এসে খবর দিলে—হাটে এক জ্যান্ত পুতুল এসেছে, কথা বলে।

রাণী তখনই ডেকে পাঠালেন দৈত্যকে।

সদাগরকে দেখে রাণী তো ভারী খুসি, বললেন—নাম কি? কোন্ দেশ থেকে আস্‌ছ?
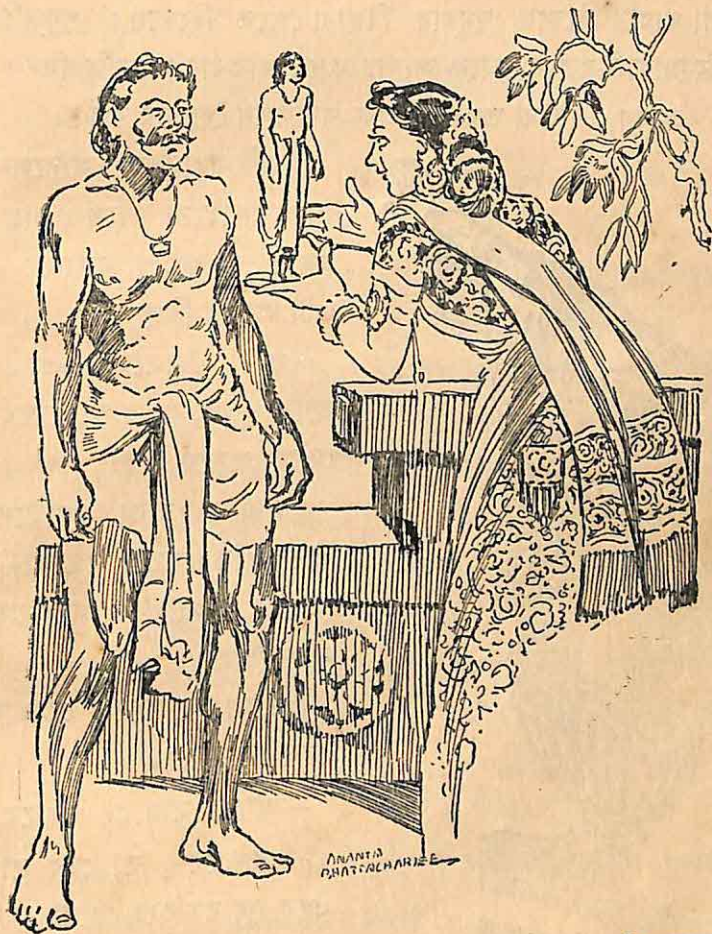
সদাগর মাটিতে মাথা ঠুকে প্রণাম জানালো। রাণী হাসলেন, বললেন—আমি একে কিনবো।

রাণী সদাগরকে কিনে নিলেন।

সদাগর বললো—রাণীমা, আপনার শ্রীচরণে আমার একটি নিবেদন আছে। খুকুমণি আমাকে অনেক আদর-যত্ন করেছে, ভালো খাবার দিয়েছে, ঘুমুবার বিছানা পেতে দিয়েছে। খুকুমণি বড্ড কান্নাকাটি করবে, তাকে আমার কাছে থাকবার অনুমতি দিন।

—বেশ!—রাণীমা তখনই লোক পাঠালেন দৈত্যের বাড়ী।

রাণী সদাগরকে আনলেন রাজা মশাইয়ের কাছে। রাজা মশাই তো অবাক, বললেন—এটা আবার কি?

রাণী বললেন—একটা জ্যান্ত পুতুল, সাগর পার থেকে ভেসে এসেছে।

সদাগর রাজা মশাইকে প্রণাম করলো, বললো—আজ্ঞে, আমি আপনার দাসানুদাস।

রাজা বললেন—তোমার দেশ কোথায়?

—আজ্ঞে, সাগরের ওপারে।

—বেশ, বেশ, তা দেখ রাণী একে খুব যত্ন করে রেখো, যেন কোন কষ্ট না হয়।

রাণীর হুকুমে সেইদিনই একটা খাঁচা তৈরী হোল, তার মধ্যে সদাগরের শোবার মত একখানি

খাট, একটি চেয়ার আর একটি টেবিল সাজিয়ে দেওয়া হোল। সদাগরকে সেই খাঁচায় পুরে পাখীর মত ঝুলিয়ে দেওয়া হোল রাণীর ঘরের বারান্দায়।

রাণী একদিন জিজ্ঞাসা করলেন—পুতুল মশাই, নৌকা চালাতে পার ?

—পারি, কিন্তু এদেশের এত বড় নৌকা তো আমি চালাতে পারবো না।

—বেশ, তোমার দেশের মত একটা ছোট খেলাঘরের নৌকা তৈরী করিয়ে দোব।

সেইদিনই রাণীমা ছুতোর ডেকে একখানি ছোট নৌকা তৈরী করার হুকুম দিলেন। আর মিস্ত্রি ডেকে বলে দিলেন, একশো হাত লম্বা আর পঞ্চাশ হাত চওড়া এক চৌবাচ্চা তৈরী করতে।

চৌবাচ্চায় জল ভরা হোল। সদাগর নৌকায় পাল তুলে দিয়ে হাল ধরে বসলো। রাণী পাখার বাতাস করতে লাগলেন, নৌকা চলতে সুরু করলো। রাণী একবার এদিকে বাতাস করেন নৌকা ওদিকে যায়, একবার ওদিকে বাতাস করেন নৌকা এদিকে ফিরে আসে। কখন-বা জোরে বাতাস লেগে নৌকা যায় উল্টে, সদাগর সাঁতরে পারে এসে ওঠে। রাণী বসে বসে মজা দেখেন আর হাসেন।

এই ভাবেই দিন কাটে। সন্ধ্যাবেলা খানিকক্ষণ নৌকা চালানো আর সারাদিন খাঁচার মধ্যে বসে থাকা।

হঠাৎ একদিন ঘটলো এক বিপদ। কোথা থেকে এক হনুমান এসে খাঁচার দরজা খুলে সদাগরকে বের করে আনলো, তারপর এক লাফে গিয়ে বসলো ছাদের পাঁচিলে।

খুকুমণি বসেছিল খাঁচার পাশে, চীৎকার করে উঠলো—গেল! গেল!

দাস দাসী সব ছুটে এলো।

হনুমানটি তখন ছাদের পাঁচিলে বসে পুতুল-মানুষটিকে নিয়ে খেলা করছে। সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখলো খানিকক্ষণ। যত দেখে তত হাসে, হেসে আর বাঁচে না—অতটুকু মানুষ আর অতবড় হনুমান!

খুকুমণি কেঁদে উঠলো, বললো—পড়বে আর মরবে গো, শিগগির যা হয় কিছু কর!

সবাই এবার ইঁট পাথর ছুঁড়ে হনুমানটাকে তাড়ালো। কিন্তু পাঁচিলের উপর থেকে সদাগরকে নামায় কে?

শেষে একখানি লম্বা মই লাগিয়ে একজন চাকর ছাদে উঠে সদাগরকে পকেটে ভরে নিয়ে নেমে এলো।

এবার থেকে সদাগরকে আরো সাবধানে রাখা হোল।

সেবার রাজা রাণী হাওয়া বদলাতে গেলেন সাগর তীরে। সদাগরকে নিয়ে গেলেন তাঁদের সঙ্গে।

একদিন খুকুমণি সাগরপারে বসে বসে রোদ পোহাচ্ছে, সদাগরের খাঁচাটী আছে তার হাতের পাশে। হঠাৎ কি হোল কে জানে, কোথা থেকে একটি চিল এসে খাঁচাটিকে ছোঁ মেরে নিয়ে উড়ে গেল।

শাঁ শাঁ করে চিল উড়ে চললো নীল আকাশের বুক দিয়ে। অসীম আকাশের যত হাওয়া এসে ঢুকলো খাঁচার ভিতর, সদাগরের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো। সে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো খাঁচার মধ্যে। বুকের মাঝে টিপটিপ করতে লাগলো, এখনি হয়তো কোথাও নেমে,

খাঁচাটি ভেঙে চিলটি তাকে ঠুকরে খাবে,—নেংটি ইঁদুরগুলোকে যেমন চিলে ঠুকরে খায়।

হঠাৎ কোথা থেকে আর একটি চিল উড়ে এলো। এই চিলটির মুখ থেকে কেড়ে নিল খাঁচাটি। আকাশের বুকে দুই চিলে বেধে গেল মারামারি। পাখার ঝাপ্‌টা আর ঠোঁটের ঠোকর। শেষে খাঁচাটি তাদের মুখ থেকে পড়ে গেল।

খাঁচাটি বরাবর এসে পড়লো সাগরের জলে। একবার ডুবলো একবার ভাসলো, আবার ডুবলো আবার ভাসলো। জলে ভরে গেল খাঁচাটি। খাট বিছানা চেয়ার টেবিল সব জলে জলময় হয়ে গেল। সদাগরের চোখে-মুখে এসে ঢুকলো যত লোনা জল। বাইরে বেরুবার কোন পথ নেই, কলে-পড়া ইঁদুরের মত সে ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলো।

কাঠের খাঁচা কিন্তু ডুবলো না। সাগরের বুকে ভেসে ভেসে চললো,—যেদিকে ঢেউ, যেদিকে হাওয়া।

এই ভাবেই কতদিন গেল, কত রাত কাটলো। শেষে একখানি জাহাজের লোক দেখতে পেয়ে খাঁচাটি তুলে নিল জাহাজে।

সদাগরের মুখে দৈত্যপুরীর গল্প শুনে জাহাজ সুদ্ধ লোক তো অবাক। কেউ বিশ্বাস করলো, কেউ-বা করলো না।

সেই জাহাজেই সদাগর দেশে ফিরলো।

তিন-মারী পালোয়ান

লোকে তাকে বলতো—তালপাতার সেপাই। অমন বেঁটে আর অমন রোগা লোক সে অঞ্চলে আর একজনও ছিল না। বুকের পাঁজরগুলো জির্ জির্ করছে তবু মাথায় একটা প্রকাণ্ড পাগড়ী—একটী কাঠির উপর যেন একটা আলু বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। মনে হয় একটু জোরে বাতাস বইলেই বুঝি পড়ে যাবে।

অমন যে মানুষ, তার একখানা তলোয়ার ছিল, যখন-তখন কোমরে তলোয়ার ঝুলতো। যখনই দেখতো কাছাকাছি কেউ কোথাও নেই, অম্‌নি তলোয়ার চালাতে সুরু করতো—যেন কোন শত্রুর সঙ্গে লড়াই করছে।

একদিন অনেকগুলো মাছি জ্বালাতন করছিল, তালপাতার সেপাই তলোয়ারের এক ঘায় তিনটী মাছিকে মেরে ফেললো। আর যায় কোথা, সেদিনই তলোয়ারের উপর সে খোদাই করিয়ে নিল—

তিন-মারী পালোয়ান

এই তলোয়ার দিয়ে আমি তিনটি দৈত্য মেরেছি

তারপর সেই তলোয়ারখানা কোমরে ঝুলিয়ে তিন-মারী পালোয়ান দেশ ভ্রমণে বেরুলো। পথে খাবার জন্য গামছায় বেঁধে নিল এক ঠোঙা ছাতু।

চলছে তো চলছেই। তেপান্তরের মাঠ আর শেষ হয় না। হাঁটতে হাঁটতে হাঁটু কন্ কন্ করে, দুপুর রোদে মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে, ঝড়ো হাওয়ায় ধুলোর ঝাপ্‌টা এসে লাগে চোখে, কপালের ঘাম গড়িয়ে আসে চিবুকে। শেষে তিন-মারী পালোয়ান এক বটগাছের ছায়ায় শুয়ে পড়লো। ভারী আরাম লাগলো, দু'চোখ বুজে এলো। ছাতুর থলিটা ঝরা পাতার নিচে লুকিয়ে রেখে নিশ্চিন্ত মনে পালোয়ান এক লম্বা ঘুম দিল।

সেই সময় সাতজন দৈত্য যাচ্ছিল সেই তেপান্তরের পথ দিয়ে। তিন-মারী পালোয়ানের তলোয়ারের পানে চোখ পড়তেই তারা চমকে উঠলো ঃ এই তলোয়ার দিয়ে আমি তিনটি দৈত্য মেরেছি।

এতটুকু মানুষের এত ক্ষমতা! এ তো সহজে বিশ্বাস করা যায় না। একবার পরখ্ করে দেখতে হয়। এক নম্বর দৈত্য ডাকলো—ও পালোয়ান মশাই! পালোয়ান মশাই !!

পালোয়ান মশায়ের ঘুম ভেঙেছে অনেক আগেই, মিট্‌-মিটে চোখে সে সামনের সাতজন দৈত্যকে আগেই দেখেছে। বুকের ভিতরটা ধড়াস্ ধড়াস্ করছে। কি যে করবে ঠিক করতে পারছে না।

এক নম্বর দৈত্য আবার ডাকলো—ও পালোয়ান মশাই! পালোয়ান মশাই !!

তিন-মারী পালোয়ান এবার চোখ মেলে তাকালো। যেন কিছুই হয়নি, এমন ভাবে উঠে বসলো, বললো—কে? কি চাই?

এক নম্বর দৈত্য বললো—আপনার গায় কি রকম ক্ষমতা আছে তাই আমরা একবার দেখতে চাই।

—দেখতে চাও? এই সন্ধ্যাবেলা গায়ের জোর দেখবার সময় হোল! একটু স্থস্থির হয়ে ঘুমুচ্ছিলাম সেটুকুও তোমাদের প্রাণে সইল না? আমার যা রাগ হচ্ছে, ইচ্ছে করছে তোমাদের মাথাগুলো এক এক ঘুসি মেরে ধুলো করে দিই—বলে তিন-মারী পালোয়ান হুম্ হুম্ করে মাটির উপর দুই ঘুসি বসিয়ে দিল। গাছের ঝরা পাতাগুলির নিচে ছাতুর ঠোঙা লুকানো ছিল, ঘুসি খেয়ে সেই ছাতু ছিট্‌কে উঠলো আকাশের গায়, একটী ধুলোর মেঘ হয়ে গেল, দৈত্য সাতজনের সর্বাঙ্গ ছাতুময় হয়ে গেল।

পালোয়ান বিরক্ত হয়ে বললো—ধ্যেৎ, এখানকার মাটী এতো নরম যে একটু আলিস্যি ভাঙবার উপায় নেই!…যাক, তোমরা এখন কি বলতে চাও বল দেখি?

দৈত্য সাতজন তখন থ' হয়ে গেছে। শুকনো মাটিতে ঘুসি মারলে ধুলোর মেঘ হয়ে যায়, এমন ব্যাপার তারা কখনও দেখেনি। প্রথমে তো তারা কি বলবে ভেবেই পেলে না। তারপর এক নম্বর দৈত্য হাত জোড় করে বললো—আপনার ঘুম ভাঙানো আমাদের অন্যায় হয়েছে, আমরা এখন তা বুঝতে পেরেছি। আপনি যদি দয়া করে আমাদের বাড়ীতে পায়ের ধুলো দেন তাহলে আমরা কৃতার্থ হই।

পালোয়ানের তো মাথা ঘুরে গেল। এখন আবার তাদের বাড়ী যেতে বলে, এ তো আচ্ছা ফ্যাঁসাদ! কিন্তু এখন দমে গেলে তো চলবে না। আবার গাছতলায় টান্ হয়ে সে শুয়ে পড়লো, বললো

—কোথাও এখন যাবার ইচ্ছা আমার নেই, আমি এখন একটা লম্বা ঘুম দোব। তোমরা যেখানে যাচ্ছ যাও বাপু, আমাকে আর জ্বালিও না।

দৈত্যদের এবার বিশ্বাস আরো বেড়ে গেল। সাত ভাই হাত জোড় করে বললো—আপনাকে একবার যেতেই হবে।

—কেন বল দিকি, বাপু ?

—আপনি একবার না গেলে, আমরা তো আর প্রাণে বাঁচি না।

—কেন, কেন শুনি ?

—আমাদের এই বনে এক গণ্ডার এসে বড় উপদ্রব করছে। আমরা সাত ভাই তাকে কিছুতেই বাগে আনতে পারছি না। আপনি যদি একবার যান ?

—কিন্তু আমি যাব কেন, বাপু ?

—আমরা আপনার পায়ে ধরছি, আপনি চলুন। একটা গণ্ডার মারা আপনার কাছে কিছুই নয়।

পালোয়ান ধড়মড় করে উঠে বসলো। মনে মনে ভাবলো, কি কুক্ষণেই সে আজ বাড়ী থেকে বেরিয়েছিল। কিন্তু মুখে রাগ দেখিয়ে বললো—তোমরা লোক বড় খারাপ বাপু, কোথায় সে গণ্ডার বলত ?

—আপনাকে যেতে হবে বনের মধ্যে।

—বেশ, তোমরা এগোও আমি তলোয়ারখানা ততক্ষণ শানিয়ে নিই।

পালোয়ান তলোয়ার নিয়ে বসলো।

দৈত্যগুলো তখনও দাঁড়িয়ে আছে দেখে পালোয়ান বললো—কী, এখনও দাঁড়িয়ে আছ যে ? বনের মাঝে গণ্ডারটা কোথায় আছে দেখে এসে বল, আমি তাকে এক কোপে শেষ করে আসবো, যাও।

সাত ভাই এবার নিশ্চিন্ত মনে বনের দিকে রওনা হোল।

পালোয়ান যেই দেখলো তারা দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে, আর সে দাঁড়ালো না, দৌড় দিল বাড়ীর দিকে। দৌড় দৌড় দৌড়।

অত রোগা আর অমন বেঁটে লোক কত আর দৌড়াবে। চলতে চলতে শেষে এক বনের ধারে সন্ধ্যা হয়ে এলো। অন্ধকারে কোথায় বাঘ-ভাল্লুকের মুখে গিয়ে পড়বে, পালোয়ান এক গাছে চড়ে বসে রইল।

গণ্ডারটা কাছাকাছি কোথায় যেন ছিল, মানুষের গন্ধ পেয়েই তেড়ে এলো গাছের নিচে। নাকের খড়গ দিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে

খুঁড়তে সুরু করলো গাছের গোড়া। উপরে পালোয়ান তো তখন ভয়ে মূর্ছা যাবার মত হয়েছে থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে ধুপ্ করে সে পড়ে গেল—পড়লো একেবারে নেই গণ্ডারের পিঠের উপরেই।

গণ্ডারটাই এবার প্রাণের ভয়ে লাফিয়ে উঠলো, তারপরেই তীরের মত ছুটলো যেদিকে ছু'চোখ যায়।

গণ্ডারের পিঠে পড়েই তিন-মারী পালোয়ান বুঝলো—বিপদের

উপর বিপদ। পিঠ থেকে পড়লে তখনই তাকে গুঁতিয়ে শেষ করে দেবে। কাজেই গণ্ডারের পিঠের উপর উপুড় হয়ে পড়ে তার কান দুটো সে প্রাণপণে টেনে ধরলো।

বনবাদাড় পার হয়ে গণ্ডার ছুটলো। এমন ফ্যাঁসাদে সে বেচারা কখনও পড়েনি? ছুটে ছুটে হয়রান হয়ে গেল, তবু পিঠের জানোয়ারটা তো পিঠ থেকে নামলো না। অন্ধকারে দেখা যায় না যে দেখবে পিঠের উপর কি আছে। শেষে এক গাছতলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে হাঁপাতে লাগলো।

দৈত্য সাতজন গণ্ডারটার সন্ধানে ফিরছিল, এবার স্থবিধা পেয়ে সাত ভাই সাত তীর মেরে তাকে শেষ করে দিলে।

পালোয়ান গণ্ডারের পিঠ থেকে নামলো, তার চোখমুখ তখন রাগে লাল হয়ে গেছে। বললো—আচ্ছা, তোমরা কেমন লোক হে? গণ্ডারটাকে আমি পোষ মানাবার চেষ্টা করছিলাম আর তোমরা খামাকা জানোয়ারটাকে মেরে ফেললে! একখানা গণ্ডারের গাড়ী করতে পারলে এই বনবাদাড়ে চলা-ফেরার কত স্থবিধা হোত বল দিকি!

সাত দৈত্য বোকা বনে গেল, এতটুকু লোকটা বলে কি! কিন্তু গণ্ডারের পিঠে চড়ে সারা বনটা যে দৌড়াদৌড়ি করতে পারে তাকে তো সহজ লোক বলে মনে হয় না। দৈত্যরা পালোয়ানকে নিয়ে চললো তাদের বাড়ীতে।

কি করে তাদের হাত থেকে রেহাই পাবে, পালোয়ান বেচারা সারা পথটা সেই কথাই ভাবতে ভাবতে চল্‌লো।

দৈত্যের বাড়ীতে পালোয়ানের দিনগুলো কাটে ভালো, দৈত্যর মা নানারকম রান্না করে খাওয়ায় আর পালোয়ান বসে বসে খোস-

গল্প করে—সবই তার নিজের বীরত্বের গল্প। কবে ছুটো কেঁদো বাঘের লেজে লেজ বেঁধে দিয়েছিল, কোন্ জঙ্গলে এক দুষ্ট হাতীর দাঁত উপ্ড়ে নিয়েছিল, কবে হাতের কাছে কিছু না পেয়ে এক জীবন্ত অজগর ধরে একদল নেকড়েকে চাব্কে দিয়েছিল, ইত্যাদি ইত্যাদি···।

শুন্তে শুন্তে সাত ভাই দৈত্যের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। এতদিনে সত্যিকারের একটা বীরপুরুষের দর্শন পেয়ে তারা নিজেদের ধন্য মনে করে।

দিনগুলো ভালোই কাটছিল। হঠাৎ একদিন রাজবাড়ীর পেয়াদা এসে জানালো—সাত ভাইকে যুদ্ধে যেতে হবে, শত্রু আসছে।

দৈত্যরা ভয় পেল, বললো—পালোয়ান মশাই, আপনিও চলুন।

পালোয়ান দেখলো এতদিনে পালাবার সুযোগ এসেছে, বললো—আমাকেও যেতে হবে? বেশ চল, কিন্তু আমার একটা মনের মত ঘোড়া চাই যে?

—তার জন্য কি!—সাত দৈত্য তখনই পালোয়ানকে ঘোড়া-শালায় নিয়ে গেল। সারি সারি অনেক ঘোড়া, তাদের মধ্যে সব চেয়ে শান্ত-শিষ্ট ঘোড়াটিকে পালোয়ান বেছে নিল। তারপর দৈত্যদের বললো—তোমরা এগোও, আমি যাচ্ছি পিছনে।

মনে মনে মতলব ছিল, দৈত্যরা যেই জঙ্গলে ঢুকবে অমনি সে ঘোড়া নিয়ে দৌড় দেবে উল্টো দিকে। যদি দৈত্যরা ধরে, বলবে —ঘোড়ার দোষ।

কিন্তু দৈত্যরা জঙ্গলে ঢুকলো না, শত্রুর মুখোমুখি এসে পড়লো এক মাঠের মাঝে। আর তাদের সেই হৈ-চৈ হুল্লোড়ের শব্দ কানে আসতেই শান্ত-শিষ্ট ঘোড়াটা ভয়ে ক্ষেপে উঠে ছুটলো ঝড়ের মত।

যেদিকে শত্রু, ঘোড়া ছুটলো সেই দিকেই। বেচারা পালোয়ান কি করবে ভেবে পেলে না। হঠাৎ হাতের কাছে একটা গাছের ডাল পেয়ে সেইটাই চেপে ধরলো, যদি কোনরকমে ঘোড়াটাকে রুখ্‌তে পারে। কিন্তু ঘোড়া থাম্‌বে কি, গাছটাই গোড়াসুদ্ধ উপড়ে এলো তার হাতে।

গাছ হাতে নিয়েই ঘোড়ার পিঠে পালোয়ান ছুটলো।

এদিকে শত্রুরা ভয় পেয়ে গেছে। চোখের উপর একটা গাছ উপ্‌ড়ে ফেললো তাদের মারার জন্য—এ তো বড় সহজ মানুষ নয়! এর সামনে একবার পড়লে তো আর রক্ষা নেই! যেদিকে পালোয়ানের ঘোড়া ছোটে সেদিকেই শত্রুরা আর দাঁড়ায় না—যেদিকে পারে দৌড় দেয়।

একজনকে পালাতে দেখলেই সবাই পালাতে সুরু করে। দেখতে দেখতে একজন শত্রুও আর মাঠে থাকে না।

এদিকে ঘোড়াও গাছ নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করে হাঁপাতে থাকে।

সাত ভাই দৈত্য তো পালোয়ানের ব্যাপার দেখে শ্রদ্ধায় গদগদ হয়ে পড়ে। এতটুকু মানুষ একটা এতবড় গাছ উপ্‌ড়ে নিয়ে কি লড়াইটাই লড়লো! পালোয়ানকে নিয়ে যে কি করবে তাই তারা ভেবে পেলে না। ফুলের মালা পরিয়ে কাঁধে তুলে নাচতে সুরু করে দিলে।

তারপর তিন-মারী পালোয়ানের বরাত ফিরে গেল, সাত দৈত্য রাজার মত আদরে তাকে রেখে দিল নিজের দেশে। পরম সুখে তার দিন কাটতে লাগলো।

আমার কথাটিও ফুরুলো—

রাজারাণীর গল্প ঃ

সূয্যি-মামার দেশে

অনেক—অনেক দিন আগের কথা। আমেরিকায় তখনও সাদা চামড়ার লোকেরা গিয়ে জুলুম স্বরু করেনি। নীল আকাশের সীমানা থেকে সাগরের কিনারা পর্যন্ত যতদূর চোখে পড়ে সবই ছিল রেড-ইণ্ডিয়ানদের নিজের দেশ।

তখন ছিল এক রাজা। রাজার ছিল এক মেয়ে। যেমন ছিল তার রূপ, তেমনি ছিল তার গুণ। সেই রূপ-গুণের কথা শুনে কত ছেলে এলো দূর-দূর দেশ থেকে, কিন্তু এসে শুনলো—সূয্যি-মামার শাপ আছে, যে সেই মেয়েকে বিয়ে করবে সেই মরবে।

কোন ছেলেরই আর সাহসে কুলায় না, মাথা উঁচু করে তারা আসে, মাথা নিচু করে তারা ফিরে যায়।

যে আসে সেই ফিরে যায়,—তাহলে কি মেয়ের বিয়ে হবে না? রাজা মহা-ভাবনায় পড়লেন।

রাজার মনোকষ্ট দেখে একটি ছেলে এগিয়ে এলো, বললো—যদি অনুমতি দেন তো আমি একবার চেষ্টা করে দেখি।

ছেলেটি ছিল বড় কদাকার, তাই কেউ তার পানে ফিরেও তাকাতো না, সবাই তার নাম দিয়েছিল 'অরূপ'।

রাজা বললেন—কি করবে তুমি?

—আমি যাব সূর্যদেবের কাছে বর চাইতে।

—তুমি পারবে কি? সূয্যি-মামার দেশ যে অনেক দূরে,—পথে নানা বিপদ, নানা কষ্ট।—

—দেখি না একবার চেষ্টা করে।

—বেশ, তোমার যখন মন হয়েছে, যাও। তবে একটা কথা, যদি সত্যি সেখানে যেতে পার, তা'হলে নিজের জন্যও একটা বর চেয়ে নিও, যেন তোমার চেহারা সুন্দর হয়,—সুপুরুষ হয়।

—বেশ—বলে অরূপ পথে বেরিয়ে পড়লো।

দিনের পর দিন ধরে অরূপ চললো—পথ চলা আর পথ চলা—পথের উপরেই কত দিন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো, পথের উপরেই কত রাত সকাল হোল। কত জলা-জঙ্গল পার হয়ে, কত পাহাড়-পর্বত ডিঙ্গিয়ে, কত নদী সাঁতরে, কত তেপান্তরের মাঠ ভেঙ্গে অরূপ চললো। পথের শেষ নেই, কতদূর যেতে হবে তা'ও জানা নেই। কোথায় গেলে সূয্যি-মামার দেখা মিলবে তা'ও কেউ বলে দেয়নি। কোথাও জন-মনিষ্যির দেখা নেই যে ঠিকানা জিজ্ঞাসা করে নেবে।

তবু অরূপ পথ চলে—চলার আর শেষ নেই।

চলতে চলতে এক নদীর তীরে এসে অরূপ থামলো। এমন চওড়া নদী সে এর আগে আর দেখেনি, এপার ওপার দেখা যায়

না। এ নদী সাঁতরে পার হওয়া সহজ নয়। অরূপ নদীর তীরে বসে ভাবতে লাগলো।

একটা রাজহাঁস জলে সাঁতার কাটছিল, তাকে ডেকে অরূপ বললো—ভাই, আমায় পার করে দেবে?

—কোথায় যাবে?

—সূয্যি-মামার দেশে।

—আমার পিঠে উঠে বস, আমি তোমাকে নিয়ে যাই।

অরূপকে পিঠে নিয়ে হাঁস উড়ে চললো। কত নদী পার হয়ে, কত বন পার হয়ে এক পথের মুখে এসে অরূপকে নামিয়ে দিলে, বললে—এই পথে বরাবর চলে যাও, ঠিক ঠিকানায় পৌঁছে যাবে।

অরূপ আবার চলতে সুরু করলো।

কিছুদূর যাবার পর চোখে পড়লো একটি চমৎকার ধনুক আর তীর-ভরা সুন্দর একটি তূণ গাছের নিচে পড়ে আছে। রোদ লেগে সেগুলো ঝল্‌মল্ করছে। অরূপের ভারী লোভ হোল, কিন্তু কার জিনিষ কে জানে! হাত দিলে না। বরাবর এগিয়ে চললো।

তেপান্তরের মাঠের ধারে একটি ছেলের সঙ্গে দেখা, সে জিজ্ঞাসা করলো—পথে কোথাও তীর-ধনুক দেখেছ? কাল রেখেছিলাম, আজ আর খুঁজে পাচ্ছি না।

—ওই যে ওখানে পড়ে আছে—অরূপ দেখিয়ে দিল।

ছেলেটি ছুটলো তীর-ধনুকের সন্ধানে।

তীর-ধনুক হাতে নিয়ে এক দৌড়ে সে ফিরে এলো অরূপের

কাছে, বললো—তুমি তো খুব ভাল লোক, তোমার নাম কি ভাই ?

—শ্রীঅরূপ।

—কোথায় চলেছ ভাই অরূপ ?

—সূয্যি-মামার কাছে।

—আমার সঙ্গে এসো। আমি তাঁর ছেলে, আমার নাম শুকতারা।

অরূপের হাত ধরে শুকতারা বাড়ী ফিরলো।

সূর্যদেবের বাড়ী। দুধ পাথরের আকাশ-ছোঁয়া অট্টালিকা। হীরের দরজা, মতির জানালা, মুক্তার মেঝে,—আলোর ঝিকিমিকি দু'চোখ ঠিক্‌রে দেয়।

শুকতারা অরূপকে মা'র কাছে নিয়ে গেল, বললো—এক ভালো-মানুষ এসেছে বাবার সঙ্গে দেখা করতে।

অরূপ প্রণাম করলো।

মা বললেন—বেশ। এখন সূর্যদেব বেরিয়েছেন পৃথিবীতে আলো ছড়াবার জন্য। সন্ধ্যাবেলা ফিরে এলে দেখা হবে। এখন খাও-দাও, খেলাধূলা কর।

শুকতারা ডাকলো,—রামধনুর সাত রঙের সাত পরী এসে অরূপকে মিষ্টি ফল, মিষ্টি জল দিল। তেমন ফল আর তেমন জল অরূপ জীবনে কখনও খায়নি। তারপর মেঘের বিছানায় শুয়ে অরূপ অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে নিলে।

বিকালবেলা শুকতারা তাকে ডাক দিল, বললো—সারাটা দিন ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলে, এবার চলো তোমাকে সাত সাগরের ঢেউ দেখিয়ে আনি, প্রবাল পাহাড়ে চাঁদের হাসি জমে আছে দেখবে না ?

অরূপের হাত ধরে শুকতারা বেরিয়ে পড়লো।

সাগর পারে একদল অসুর এসেছিল মাছ ধরতে। সূয্যি-মামার সঙ্গে ছিল তাদের ঝগড়া, শুকতারাকে একা পেয়েই তারা তেড়ে এলো। কেউ হোল সাপ, কেউ হোল পাখী, কেউ গণ্ডার, কেউ বা অক্টোপাস। চারিপাশ থেকে সবাই ঘিরে ধরলো শুকতারাকে।

ছেলেমানুষ একা পারবে কেন, হাঁপিয়ে পড়লো।

অরূপ কিন্তু ছাড়লো না, তীর-ধনুক বাগিয়ে ধরে মারতে সুরু করলো যাকে সামনে পেল। দেখতে দেখতে যুদ্ধ জমে উঠলো।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো, সূর্যদেবের রথ এসে লাগলো

সাত সাগরের পারে। দিনের কাজ সেরে সূয্যি-মামা ফিরলেন অস্তাচলে। অসুরেরা আর দাঁড়ালো না, সাগরের নিচে অন্ধকারে পালিয়ে গেল।

শুকতারা ছুটে গিয়ে বললো—বাবা, অরূপ আজ আমাকে বাঁচিয়েছে।

—কে অরূপ ?—সূর্যদেব মুখ তুলে তাকালেন।

অরূপ প্রণাম করলো, সূর্যদেব বললেন—তুমি কি চাও ?

--আমাদের রাজকন্যাকে আপনি আশীর্বাদ করুন, বিয়ের পর সে যেন বিধবা না হয়।

—তথাস্তু। আর কি চাও ?

—আমার এই কদাকার দেহটা আপনার আশীর্বাদে সুন্দর হোক।

—তাই হোক্।

চোখের নিমেষে অরূপ সুন্দর সুপুরুষ হয়ে গেল। অরূপ সূর্য-দেবকে প্রণাম করে বিদায় নিল। শুকতারা তাকে দেখিয়ে দিল রামধনুর রাস্তা,—সাতরঙা পথ বেয়ে অরূপ ফিরে এল তার দেশে।

তারপর একদিন রাজকন্যার সঙ্গে অরূপের বিয়ে হয়ে গেল—কত ধুম্‌ধাম্ হোল, কত ঢাক-ঢোল বাজলো, কত লোক-জন লুচি-সন্দেশ খেলো।

আমার কথাটিও ফুরুলো…

চীনের ঘণ্টা

এক ছিল রাজা।—

হঠাৎ একদিন রাজার খেয়াল হোল, রাজধানীতে বিরাট এক ঘণ্টা তৈরী করাবেন—যেমনি হবে বড়, তেমনি হবে তার শব্দ, সারা সহরময় শোনা যাবে তার আওয়াজ। তার জোড়া মিলবে না সারা চীনদেশে।

তখনই ডাক পড়লো সহরের সব-সেরা কারিগরের।

রাজা বললেন—তোমাকে এমন ঘণ্টা তৈরী করতে হবে যেমনটি আর কখনও হয়নি।

—যে আদেশ মহারাজ—বলে কারিগর কাজ সুরু করলো। খুসি মনে দিন-রাত সে খেটে চললো। এতদিনে সত্যিকারের একটা ভালো কাজ,—একটা বড় কাজ করার সুযোগ তার মিলেছে, সেও

এমন কাজ করবে যে মহাকালের বুকে তার নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। দিনরাত হাড়ভাঙা খেটে কারিগর তৈরী করলো এক প্রকাণ্ড ছাঁচ, তারপর পিতল গালিয়ে ঢালা হোল সেই ছাঁচে।

কিন্তু কোথায় কি দোষ হোল কে জানে, ক্বড়াৎ করে ছাঁচ গেল ফেটে, ঘণ্টা তৈরী হোল ভাঙা।

রাজা দুঃখিত হলেন, পাত্রমিত্র সভাসদেরা দুঃখিত হোল। কিন্তু সবার চেয়ে বেশী দুঃখিত হোল কারিগর—তার এতো দিনের মেহনৎ এইভাবে নষ্ট হোল, জীবনে কখনও এমন হয়নি।

রাজা বললেন—বেশ, আবার তৈরী কর।

কারিগর এবার আহার-নিদ্রা ত্যাগ করলো। আগের চেয়েও বেশী যত্ন করে নিখুঁৎ করে ছাঁচ তৈরী করলো। আবার পিতল গালিয়ে ঢালা হোল সেই ছাঁচে।

এবার ছাঁচ আর ফাটলো না, কারিগরের মুখে হাসি ফুটলো।

কিন্তু ছাঁচ যখন জুড়ালো, ফুটন্ত পিতল জমাট বাধলো, কারিগর ছাঁচ ভেঙে ঘণ্টা বের করলো, তখন সবাই দেখে ঘণ্টার চারিপাশে অজস্র ফুটো, যেন একটা পিতলের মৌচাক তৈরী হয়েছে। দুঃখে কারিগরের মুখ ম্লান হয়ে গেল।

রাজার রাগ হোল, বললেন—বার বার এতো টাকার পিতল নষ্ট। এই তোমার কাজের ছিরি, আর তোমাকেই বলে কিনা চীনদেশের সব-সেরা কারিগর? তুমি নিশ্চয়ই ফাঁকি দিয়েছ!

কারিগর কাঁপতে কাঁপতে হাতজোড় করে বললো—মহারাজ, আমাকে আর একবার সুযোগ দিন।

রাজা বললেন—বেশ, বার বার তিনবার। এবার যদি ঠিকমত না হয় তোমার গর্দান যাবে।

কারিগর তো বাড়ী এসে মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসলো। যেখানে যত পুঁথি-পত্র ছিল পাতা উল্টে দেখলো। কিন্তু কোথায় যে তার ভুল হচ্ছে তা বুঝতে পারলো না। সবই যদি ঠিক হোল তাহলে ঘণ্টা ঠিক হোল না কেন? সারা জীবন ধরে সে এই কাজ করে এলো, কখনও তো এমন হয়নি। বেচারা যতই ভাবে ততই বুদ্ধি ঘুলিয়ে যায়। নাওয়া-খাওয়া আর ভালো লাগে না, ভাবনায় ঘুম হয় না সারারাত।

কারিগরের এক মেয়ে ছিল, বাপের কষ্ট দেখে তার ভারী দুঃখ হোল। বাড়ীর কাছে এক গণৎকার থাকতো, ছুটে গেল তার কাছে, বললো—গুনে বলুন তো, বাবার ঘণ্টা ঠিক হচ্ছে না কেন?

গণৎকার সব শুনলো, তারপর বসলো খড়ি পেতে গুনতে। অনেকক্ষণ নানা হিজি-বিজি কেটে কত কি হিসাব করলো, তারপর

বললো—ভালো ঘণ্টা তৈরী করা সহজ নয়, যতই খাটুক্ ঘণ্টা তৈরী হবে না।

মেয়েটি বললো—কেন ? কেন ?

গণৎকার বললো—নরবলি দিতে হবে। গণনায় পেলাম, যদি কোন মেয়ে নিজেকে আহুতি দিয়ে অগ্নিদেবকে তৃপ্ত করতে পারে তবেই ঘণ্টা সুন্দর ও সম্পূর্ণ হবে। নাহলে ঘণ্টা কোনদিনই ভালো হবে না। একটা না একটা খুঁৎ থেকে যাবেই।

মেয়েটি বললো—আর কোনো উপায় নেই ?

গণৎকার বললো—গণনায় তো আর কিছু পাই না।

মেয়েটি চিন্তিতমুখে বাড়ী ফিরলো। গণৎকারের কথাটা বারবার তার মনের মাঝে তোলাপাড়া হতে লাগলো—যদি কোন মেয়ে নিজেকে আহুতি দিয়ে অগ্নিদেবকে তৃপ্ত করতে পারে, তবেই—

কারিগর এদিকে আবার নতুন করে ছাঁচ তৈরী করতে সুরু করলো—আগের চেয়েও বেশী পরিশ্রম করে, আগের চেয়েও বেশী নিখুঁৎ করে। মেয়ের কাছে বললো—জানিস্ মা, যা কিছু করবার সবই তো করলাম, এবারও যদি খুঁৎ হয়, কি করবো বলতো ?

মেয়ে বললো—না বাবা, আর খুঁৎ থাকবে না, আমি যে অগ্নি-দেবের আশীর্বাদ পেয়েছি।

—দেখি !—বলে কারিগর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো—আমার নিজের উপর আর বিশ্বাস নেই মা !

ছাঁচ সম্পূর্ণ হোল। রাজা ভালো করে দেখলেন, মন্ত্রী দেখলো, সেনাপতি দেখলো, সভাসদেরা ভালো করে দেখলো, সবাই বললো —হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে।

এবার ছাঁচে পিতল ঢালতে হবে। প্রকাণ্ড কড়াই করে টগবগে

ফুটন্ত পিতল আনা হোল। পাশে দাউ দাউ করে অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে। এমন সময় কোথায় ছিল কারিগরের সেই মেয়েটি, ছুটে এসে লাফিয়ে পড়লো সেই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মাঝে। চারিপাশে হৈ-চৈ পড়ে গেল। কারিগর ছুটে গেল মেয়েটিকে ধরবার জন্য ; কিন্তু ধরতে পারলো না। সকলের সামনেই মেয়েটি পুড়ে মরলো। সবাই 'হায় হায়' করতে লাগলো।

তাড়াতাড়ি ছুটে যাবার সময় মেয়েটির একপাটি জুতো খুলে পড়ে যায়, কারিগর সেই জুতোটি তুলে নিলে। তু'চোখ তখন তার জলে ভরে গেছে। কিন্তু কাজের সময় কাঁদবার অবসর কোথায়, চোখের জল চোখে রেখে কারিগর কাজ শেষ করলো।

পিতল ঢালাই হোল। ছাঁচ ঠাণ্ডা হোল। তারপর ছাঁচ ভেঙে ঘণ্টা বেরুলো। নিখুঁৎ সুন্দর প্রকাণ্ড এক ঘণ্টা। দেখে সবাই বললো—চমৎকার! সত্যি এই কারিগর সবার সেরা। এতো বড় জিনিষ এমনভাবে তৈরী করতে আর কেউ পারতো না।

কারিগর মেয়ের সেই একপাটি জুতো নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরলো।

ঘণ্টা তো তৈরী হোল, এবার রাজা প্রকাণ্ড এক খিলান তৈরী করালেন। সেই খিলানে ঘণ্টা ঝুলিয়ে দেওয়া হোল। তারপর সেই ঘণ্টার ধ্বনি উঠলো—ঢং ঢং ঢং।

শুধু ঢং ঢং ঢং করেই বাজে না, মনে হয় প্রতি শব্দের পরে সে যেন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছে আর বলছে—শিয়ে—শিয়ে——ঢং শিয়ে—ঢং শিয়ে—ঢং শিয়ে—

চীনা ভাষায় 'শিয়ে' মানে জুতো। যারা শোনে তারা বলে—

বেচারা কারিগরের মেয়ে কাঁদছে তার ফেলে-যাওয়া একপাটি জুতোর জন্য।

তারপর কতদিন কেটে গেছে, সেই কারিগরের নাম আজ আর কারুর মনে নেই।

কিন্তু পিকিং সহরের সেই বিরাট ঘণ্টা আজও আছে, আজও তেমনি বাজে—ঢং ঢং ঢং। আজও তেমনি দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যায়—শিয়ে, শিয়ে, শিয়ে!

আজ অবধি সেই একপাটি জুতোর জন্য কারিগরের মেয়ের কান্না শেষ হয়নি।

আরো কত যুগ সে এমনিভাবে কাঁদবে, কে জানে।

রাজা ও প্রজা

এক ছিল রাজা।

যেমন ছিল তাঁর প্রতাপ তেমনি ছিল তাঁর অহঙ্কার। সবাইকেই তিনি ছোট করে দেখতেন, কথায় কথায় বলতেন—প্রজা আবার কি, সবাই রাজার চাকর, সবাই আমার দাস।

সবাই মাথা হেঁট করে শুনতো, কিন্তু কোন প্রতিবাদ করার সাহস কারুর ছিল না, প্রাণের ভয় ছিল সবারই।

এক ছিল বুড়ো, কথাটা তার কানেও পেঁাছালো, ঠুক্ ঠুক্ করে লাঠিতে ভর দিয়ে একদিন সে এসে দাঁড়ালো রাজসভায়, বললো—প্রণাম, মহারাজ!

রাজা বললেন—কি চাই তোমার?

—আপনাকে একটা কথা বলতে চাই, মহারাজ!

—বল?

—আপনি প্রায়ই বলেন যে, প্রজারা আপনার চাকর। কিন্তু

রাজাও যে প্রজাদের সেবক সে সত্যটুকু আপনি ভুলে গেছেন।

—কী !—রাজার চোখমুখ লাল হয়ে উঠলো,—তুমি আমাকে এই কথা শোনাতে এসেছ ? তোমার স্পর্ধা তো কম নয়।

—এটা শুধু একটা কথা নয় মহারাজ, এটা একটি সত্য,—আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সেবকমাত্র। এ ঈশ্বরের বিধান, এখানে রাজা প্রজা বলে কোন ভেদ নেই। নিজ নিজ সামর্থ্য মত প্রত্যেকেই অপরের সেবা করে থাকেন।

—অর্থাৎ আমি তোমাদের চাকর ?

—আপনি সমস্ত প্রজার সেবা করছেন বলেই তো আপনি রাজা।

রাজার মাথার ভিতর রি-রি করে উঠলো, ইচ্ছা হোল তখনই বুড়োর গর্দান নেবার আদেশ দেন। কিন্তু আশী বছরের বুড়ো, মাথার সব চুল পেকে সাদা হয়ে গেছে, তার উপর কোন দণ্ডাদেশ দিতেও মন চায় না। বললেন—প্রমাণ করতে পার, তোমার কথা কতদূর সত্যি ?

—প্রমাণ ? হাতে-হাতে প্রমাণ দিতে হবে মহারাজ ?

—হ্যাঁ, আজ সন্ধ্যার মধ্যেই প্রমাণ চাই, না হলে তোমার গর্দান যাবে।

—আর প্রমাণ করতে পারলে মহারাজ কি পুরস্কার দেবেন ?

—প্রমাণ করতে পারলে একশো গাই পুরস্কার দোব !

—বেশ, আজ সন্ধ্যার আগেই প্রমাণ দোব।—বলে বুড়ো ঠুক্ ঠুক্ করে রাজসভা থেকে বেরিয়ে এলো। ফটক পার হচ্ছে এমন সময় এক ভিখারী এসে দাঁড়ালো সামনে। বললো—দু'দিন কিছুই খাওয়া হয়নি, কিছু ভিক্ষে পাই, বাবা ?

বুড়ো ফিরলো। প্রজারা নতুন বছরের ভেট পাঠিয়েছে রাজার

কাছে। চাল-ডাল, ফল-মূল স্তূপাকার হয়েছে সভার একপাশে। বুড়ো বললো—মহারাজ, যদি অনুমতি করেন তো এ থেকে দুটো ফল ওই ভিখারীকে দিই, দু'দিন ধরে ওর কিছুই খাওয়া হয়নি।

আর কেউ একথা বললে রাজা তার উপর শঙ্করমাছের চাবুক চালাতেন, নেহাৎ আশী বছরের বুড়ো ! দাঁতে দাঁত চেপে বললেন—বেশ,দাওগে—

বুড়ো দুটো বড় নারিকেল বেছে নিয়ে ভিখারীকে দিতে গেল। হঠাৎ লাঠি গাছটা পিছ্‌লে গেল তার হাত থেকে। থর থর করে বুড়ো কেঁপে উঠলো, এখনি বুঝি পড়ে যায় ! কাঁপতে কাঁপতে বুড়ো বললো—আমার লাঠি ! আমার লাঠিখানা !

রাজা পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

বুড়ো তখনি পড়ে যায় দেখে রাজা তাড়াতাড়ি নত হয়ে লাঠিটা তুলে দিলেন।

লাঠিটা হাতে নিয়ে বুড়ো হাসলো, বললো—ধন্যবাদ মহারাজ, ভগবান আপনার মঙ্গল করুন ! আমার মত সামান্য একজন প্রজার জন্য আপনি যা করলেন, তা আপনার মহত্বের পরিচয়। আপনার প্রজাসেবক নাম সার্থক হোক্।

রাজা এবার নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। বুড়ো যে এতো তাড়াতাড়ি প্রমাণ দেবে তা তিনি ভাবতেও পারেন নি।

বুড়ো বললো—সজ্জনেরা পরের সেবা করে মহারাজ, সেইটাই মনুষ্যত্ব, অমানুষেরা করে শুধু অহঙ্কার।

রাজা বললেন—তোমার কাছে আমি আজ নতুন শিক্ষা পেলাম বৃদ্ধ, তোমার জন্য একশত গাই—

বৃদ্ধ বললো—আমি আশী বছর যেভাবে কাটিয়েছি বাকী

কয়েকটা দিনও সেইভাবেই কাটাতে পারবো। আপনি গাইগুলো ওই ভিখারীকে দিন।
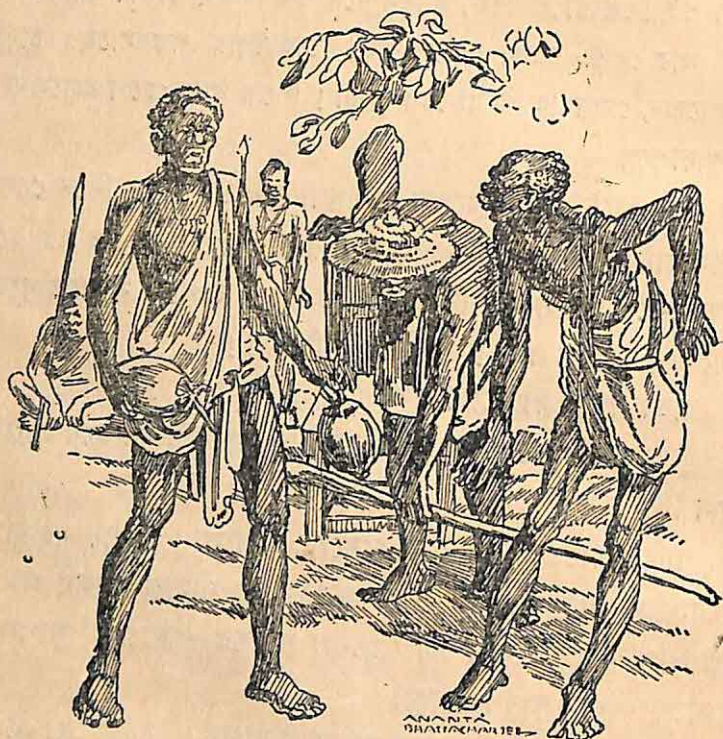
রাজা এবার মুগ্ধ হলেন। বুড়োকে তিনি ছাড়লেন না, বললেন —বাকী যে ক'দিন তুমি বাঁচবে আমার কাছেই থাক, আমি তোমাকে আজ থেকে আমার মন্ত্রী করলাম।

সেইদিন থেকে সে রাজ্যের প্রজাদের আর কোন দুঃখ রইল না।

আমার কথাটিও ফুরুলো।—

সাদা ছবি

রাজার সখ হোল ছবি আঁকাতে হবে, তখনই হুকুম দিলেন,—আঁকিয়ে চাই! দেশ-বিদেশে রাজার লোক ঢাক পিটিয়ে দিল—একজন ভালো আঁকিয়ে চাই, রাজার ছবি আঁকতে হবে!

কতজন এলো, কাউকেই রাজার মনে ধরলো না। সবার শেষে এলো এক কিশোর চিত্রকর, বললো—মহারাজ, আমি আপনার ছবি আঁকবো।

রাজা বললেন—এতো কম বয়সে কি ছবি তুমি আঁকবে? কি তোমার নাম?

—আজ্ঞে, আমার নাম ছায়াগুপ্ত। আমার বয়স দেখে আমার ছবির বিচার করবেন না। অনেকদিন ধরে আমি ছবি আঁকছি, সঙ্গে একখানা ছবি এনেছি, আপনারা দেখলেই বুঝবেন—চাদরের ভিতর থেকে একখানি ছবি বের করে ছায়াগুপ্ত রাজার দিকে এগিয়ে দিল।

ছবি দেখে রাজা খুসি, মন্ত্রী খুসি, পারিষদেরা খুসি। রাখাল শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজাচ্ছেন, সেই বাঁশীর সুরে বাছুরগুলো নাচছে। গাছের পাতায় সোণালী রোদ নেমে এসেছে, যমুনার জল চিক্‌মিক্

করছে, সবুজ মাঠ মিশে গেছে পাহাড়ের কোলে আকাশের গায়। দেখে দেখে ছবিখানি যেন আর শেষ হয় না। চোখ ফেরানো যায় না। রাজা বললেন—চমৎকার!

মন্ত্রী বললেন—চমৎকার!

পারিষদেরা বললো—চমৎকার!

রাজা বললেন—বেশ, তুমি আমার ছবি এঁকে দাও—ভালো করে ছবি আঁকলে হাজার মোহর বকশিষ দোব!

ছায়াগুপ্ত বললো—প্রভু, আমার একটা কথা বলার আছে, একা মহারাজের ছবি আঁকার চেয়ে, একটা রাজসভার ছবি দেখতে অনেক ভালো হবে। পাত্র-মিত্র-পারিষদদের নিয়ে মহারাজ বসে আছেন, —দেখতে হবে জম্‌জমাট!

রাজা বললেন—বেশ, তাই হোক্!

পরদিন এক বিরাট পটে ছায়াগুপ্ত রাজামশাইয়ের ছবি আঁকতে সুরু করলো।

রাজসভার ছবি।

বিকালের দিকে রাজা এসে সামনে বসেন, ছায়াগুপ্ত দেখে আর পটের উপর রেখা টানে। রাজা বললেন—দেখ, আমার ভুঁড়ীটা তুমি একটু কমিয়ে দিও, নাহলে বড় খারাপ দেখাবে।

ছায়াগুপ্ত মাথা নেড়ে বললো—আচ্ছা!

রাজার পরে আঁকা হবে মন্ত্রীর ছবি। মন্ত্রী মশাই বুড়ো হয়েছেন, দাড়ী পেকে সাদা হয়ে গেছে, বয়সের ভারে মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে। কপালে অনেকগুলি খাঁজ পড়েছে। মন্ত্রী বললেন —শিল্পী, আমার চেহারা একটু মানানসই করে এঁকো, নাহলে রাজার অমন চেহারার পাশে আমাকে বড় বিশ্রী দেখাবে। তুমি বাপু,

আমায় একটু কম বয়সের করে এঁকো—পিঠটা যেন সোজা হয়। আর সত্যি কথা বলতে কি, চিরকাল তো আর কুঁজো ছিলুম না!

ছায়াগুপ্ত হেসে বললো—সে কি হয় মন্ত্রী মশাই, আপনার যা চেহারা তাইতো আঁকবো!
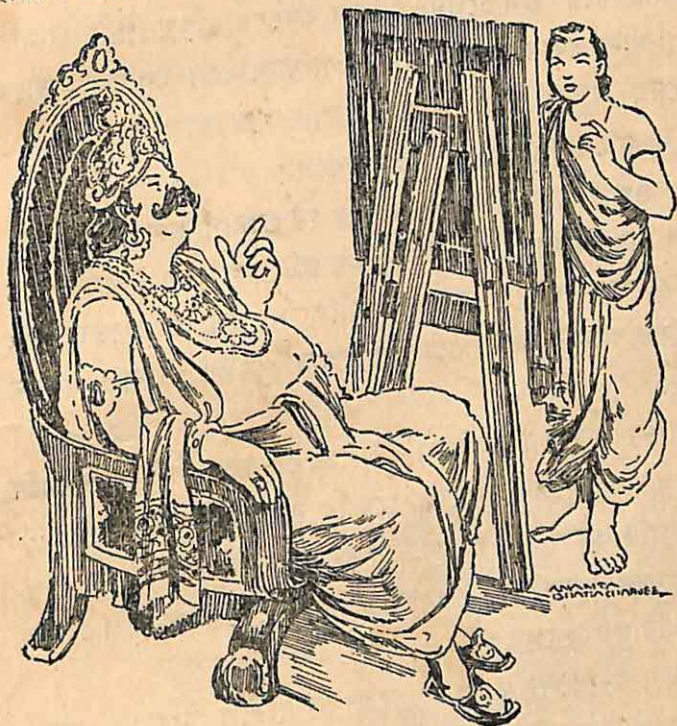
মন্ত্রী বললেন—বটে! আমার কথার উপর কথা! তোমার স্পর্ধা তো কম নয়। আমার এই চেহারা এঁকো দিকি, দেখবো তোমার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে!

ছায়াগুপ্ত পটে রেখা টানা বন্ধ করলো, চুপ করে বসে ভাবতে লাগলো সে কি করবে।

মন্ত্রীর পরে এলেন সেনাপতি। বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা, ইয়া গোঁপে চাড়া দেওয়া, লাল ঝক্‌মকে পোষাক, কোমর থেকে প্রকাণ্ড একখানি তলোয়ার ঝুল্‌ছে। কিন্তু এসব হলে কি হয়, কোথাকার কোন্ লড়ায়ে সেনাপতির একখানি পা কাটা গেছে, এক বগলে একটি লাঠি নিয়ে তিনি চলেন। তিনি বললেন—দেখ শিল্পী, আমার কাটা পা-খানা সমান করেই এঁকো, পা-খানা তো সেদিন লড়ায়ে কাটা গেল নাহলে তো আস্তই ছিল, আর রাজসভার ছবি—তার মধ্যে সেনাপতির পা কাটা থাকবে!

ছায়াগুপ্ত বললো—তা কেমন করে হয় সেনাপতি মশাই?

আর যায় কোথা, সেনাপতির চোখ দুটি লাল হয়ে উঠলো, গর্জন করে উঠলেন—বটে! দেখবো হয় কি না হয়, এ রাজ্যের দশ হাজার সৈন্য আমার কথায় ওঠে বসে, আর তুমি তো সামান্য একজন চিত্রকর!

ছায়াগুপ্ত তাড়াতাড়ি বললো—আজ্ঞে, সে কথা বলছিনে, আপনি যা আদেশ করবেন তাই করবো, তবে কি না আমরা গরীব লোক···

সেনাপতি এবার খুসি হলেন, একমুখ হেসে বললেন—বেশ বেশ, এই নাও তোমার বক্‌শিষ—সেনাপতি পকেট থেকে একমুঠো মোহর তুলে দিলেন ছায়াগুপ্তের হাতে।

তারপর কোটালের পালা। রোগা ছিপ্‌ছিপে চেহারা, কোমর থেকে প্রকাণ্ড একখানি তলোয়ার ঝুলছে, ঠিক যেন এক তালপাতার সেপাই। তার উপর দাঁতগুলো ঠোটের পাঁচিল টপ্‌কে বেরিয়ে এসেছে। ছায়াগুপ্তের সঙ্গে তারও সেই এক কথা—শরীরটাকে একটু মোটা করে এঁকো চিত্রকর, আর দাঁতগুলো যেন বেরিয়ে না থাকে!

—কিন্তু—বলে ছায়াগুপ্ত মাথা চুলকায়।

—কিন্তু ফিন্তু বুঝিনে, যা বললুম তাই করবে, নাহলে এ রাজ্যে মাথা বাঁচিয়ে চলা-ফেরা করাই তোমার দায় হবে, তা আগেই বলে রাখছি !

এবার ছায়াগুপ্ত বেশ চালাক হয়ে গেছে, বললো—সে তো আঁকবই, তবে কি জানেন, আমরা গরীব লোক…

কোটাল তখনই কয়েকখানি মোহর বকশিষ করে দিল।

এবার এলেন রাজার সভাপণ্ডিত। সমস্ত দেহের তুলনায় তাঁর পেটটি বেশ বড়। তাঁরও সেই একই কথা,—ভুঁড়ীটি ছোট করে আঁকতে হবে। ছায়াগুপ্ত তাঁর কাছ থেকেও বকশিষ আদায় করলো, উপরি পেল আশীর্বাদ !

এমনিভাবে একজনের পর একজন সভাসদ্ আসে, তাদের দেহের খুঁৎগুলো শুধ্‌রে নেবার জন্য বারবার করে বলে যায় ছায়াগুপ্তকে, ত্থ'চারখানা করে মোহরও ঘুষ দেয়।

রাজা একদিন সভার মাঝে শিল্পীকে বললেন —ছবি আঁকা হচ্ছে কেমন ?

—কাজ বেশ এগুচ্ছে মহারাজ !

—যদি ঠিক ঠিক ছবি আঁকতে পার, আমি তোমাকে আরো হাজার মোহর বকশিষ দোব। আর ছবি যদি খারাপ হয়, ভুল্-চুক দেখি, তাহলে তোমার গর্দান যাবে !

ছায়াগুপ্ত এবার সত্যই ভাবনায় পড়লো। মন্ত্রীমশাইয়ের পিঠ সোজা করে আঁকলে, সেনাপতির কাটা পা'খানা আস্ত করলে, কোটালের দাঁত কমিয়ে দিলে, সভাপণ্ডিতের ভুঁড়ী বাদ দিলে ভুল হবেই। আসল লোকের সঙ্গে ছবি তো মিলবে না, গর্দান যাবে। তার চেয়ে ছবি না আঁকাই ভালো। কিন্তু তাহলেও তো গর্দান যাবে। তাহলে?...

ছায়াগুপ্ত হাতজোড় করে বললো—মহারাজ, আমাকে একটু নিরিবিলিতে ছবি আঁকতে দিন্—এই ক'দিন কেউ যেন আমায় জ্বালাতন না করে।

তখনই রাজবাড়ীর একখানি ঘরে শিল্পীর একা থাকার ব্যবস্থা হয়ে গেল।

ছায়াগুপ্ত আপন মনে যা ভাল লাগে তাই আঁকে, শুধু রাজসভার ছবিখানিই আঁকে না।

এক মাস পরে রাজা একদিন ডেকে পাঠালেন—শিল্পী, তোমার ছবি আঁকা শেষ হয়েছে?

—আরও ক'দিন দেরী আছে, মহারাজ।

—বেশ, আরও সাতদিন সময় দিলুম।

সাতদিন পরে আবার ডাক পড়লো—শিল্পী!

—আরো তিনদিন সময় চাই মহারাজ!

তিনদিন পরে আবার ডাক পড়লো—শিল্পী!

—ছবি শেষ করেছি মহারাজ। আপনারা যদি দয়া করে আমার ঘরে আসেন—।

—চলো—রাজা উঠলেন।

মন্ত্রী কোটাল সেনাপতি—সারা সভাই উঠে দাঁড়ালো।

শিল্পী বললো—কিন্তু ছবি দেখবার আগে আমি ছবি সম্বন্ধে দু-একটী কথা বলতে চাই। এতো পরিশ্রম করে আমি এর আগে আর কোন ছবি আঁকিনি। দেখলেই আপনারা বুঝতে পারবেন কেমন ছবি হয়েছে। মন্ত্রপূত রঙে আমি ছবি এঁকেছি, এ ছবি পাঁচ-সাতশো বছর ঠিকই থাকবে। তবে মন্ত্রের বিশেষত্ব হচ্ছে চোর, জুয়াচোর, ছোটলোক, ভীরু প্রভৃতি এ ছবি দেখতে পাবে না, দেখবে শুধু সাদা পট।

ছায়াগুপ্ত ছবির ঢাকা সরিয়ে দিল।

পটের পানে তাকিয়ে সবাই বলে উঠলো—চমৎকার! রাজা-মশাইয়ের ছবিখানি কি সুন্দরই না হয়েছে।

সাদা পটের পানে তাকিয়ে রাজা তো থ' হয়ে গেলেন।

রাজ-নাপিতের বয়স হয়েছে, সে বললো—পট তো সাদা মহারাজ, ছবি কোথায়?

ছায়াগুপ্ত বললো—তুমি ভীরু লোক, তুমি তো দেখতে পাবে না। আর সবাই ঠিক দেখছে, জিজ্ঞেস কর?

সবাই মাথা নেড়ে বললো—আমরা তো দেখছি, ওই যে মহারাজ বসে আছেন, পাশে মন্ত্রী মশাই!

শিল্পী এবার চাইল—মহারাজ, আমার বকশিষ?

রাজা বললেন—কাল রাজসভায় এসো—!

চিন্তিতমুখে রাজা সভাসদ্‌দের সঙ্গে ফিরে গেলেন।

পরদিন চিত্রকর সভায় যেতেই রাজা বললেন—শিল্পী, তুমি রাজার সঙ্গে চালাকি করতে এসেছ ?

ছায়াগুপ্ত ভয় পেলে, বললো—কি করি মহারাজ, ছবি আঁকলেই আমার গর্দান যেতো বলে আঁকিনি।

—কি রকম ?

—ছবি ঠিক না হলে আপনার আদেশে গর্দান যেত, আর ছবি ঠিক হলে মন্ত্রী, সেনাপতি, কোটালের কাছ থেকে মাথা বাঁচানো দায় হতো ! তাই মোটেই ছবি আঁকিনি !

শিল্পী সব কথা খুলে বললো।

রাজা বললেন—তুমি তাহলে এই পাঁচ সপ্তাহ সময় নষ্ট করলে কেন শিল্পী ?

—নষ্ট করিনি মহারাজ, পাঁচখানি ভাল ছবি এঁকেছি।

ছায়াগুপ্ত পাঁচখানি চমৎকার ছবি রাজার হাতে তুলে দিলে।

ছবি দেখে রাজা খুসি হলেন, শিল্পীকে রাজ-শিল্পী করে দিলেন সেইদিন থেকে।

ঘুঁটে কুড়ানী ঃ

মা-বাপ মরা মেয়ে, দুনিয়ায় আপনার জন বলতে তার কেউ ছিল না। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সৎমা কেবলই তাকে হুকুম করতো—ঘুঁটে দাও, কয়লা ভাঙো, উনুনে আগুন দাও, বাসন মাজো, ঘর ঝাঁট দাও, কাপড়ে সাবান লাগাও!

কাজের আর শেষ নেই, এক মিনিট বসতে সময় নেই, 'পারছি না' বললেও রেহাই নেই।

তার উপর যখন-তখন মার—কিল চড় লাথি ঝাঁটা।

কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলে যায়। খেটে খেটে গায়-গতরে ব্যথা। ছেঁড়া কাপড়ে ছাই-গোবরে পুকুর পাড়ে বসে বসে চোখের জল ফেলে। সৎতাতো বোনেরা ফুলকাটা জামা গায়ে, জরীর জুতো পায়ে, নাক সিট্‌কায় আর বলে—ছাই-মাখানী, ঘুঁটে-কুড়ানী, আমাদের পাঁশরাণী!

এমনিভাবেই দিন যায়, বছরের পর বছর কাটে। একদিন রাজবাড়ী থেকে নিমন্ত্রণ হোল রাজ্যসুদ্ধ মেয়ের। সারা দেশের

মেয়ের মাঝ থেকে রাজপুত্র তার কনে বেছে নেবে। যাকে দেখতে সবার চেয়ে ভালো, গুণে যে সবার সেরা, সেই হবে রাজবাড়ীর বউ। কার কপাল খুলবে কে জানে।

সৎমা সৎতাতো দুই বোনকে সাজিয়ে দিলে,—রেশমের জামা পরালো, জরীর জুতো পায়ে দিল। পাঁশরাণী বললো—মা, আমিও যাব—

সৎমা বললো—তুই যাবি কোন্ কাজে ?

—রাজার বাড়ী তো কখনো দেখিনি, কত জাঁকজমক, কত রকমারী খাবার…

সৎমা বললো—আহাহাঃ, আদিখ্যেতা দেখে আর বাঁচিনে !

হাতে পায়ে ছায়ের কাঁড়ি,
চুলের গোছা শোনের নুড়ি,
উনি যাবেন রাজার বাড়ী,
মণ্ডা খাবেন ঝুড়ি ঝুড়ি !

রাজবাড়ীর চাকরাণীগুলোও তোকে ছোঁবে না !

সৎমা দু'মেয়েকে নিয়ে চলে গেল রাজবাড়ী। পাঁশরাণী বসে বসে কাঁদতে লাগলো পুকুর পাড়ে।

কখন্ কোথা থেকে সামনে এসে দাঁড়ালো এক পরী, বল্‌লো—কাঁদ্‌ছ কেন খুকী ! চলো, আমি তোমাকে নিয়ে যাব—

পাঁশরাণী উঠে দাঁড়ালো।

পরী বললো—একটা ভালো কুম্‌ড়ো আনো দিকি বাগান থেকে—

পাঁশরাণী ছুটে গিয়ে উঠানের মাচা থেকে একটা কুম্‌ড়ো তুলে আনলো। পরী কুমড়োটার উপর একবার হাত বুলোতেই সেটী একটী চমৎকার জুড়ী গাড়ী হয়ে গেল।

পরী বললো—ইঁদুর কলে ছ'টী নেংটী ইঁদুর পড়েছে, কলটী নিয়ে এসো দিকি—

পাঁশরাণী ইঁদুর-কলটি এনে পরীর হাতে দিল। পরী এক একটী করে ইঁদুরের গায়ে হাত বুলায় আর সেটী একটী করে ঘোড়া হয়ে যায়। দেখতে দেখতে ছ'টী ইঁদুর ছ'টী ঘোড়া হয়ে গেল।
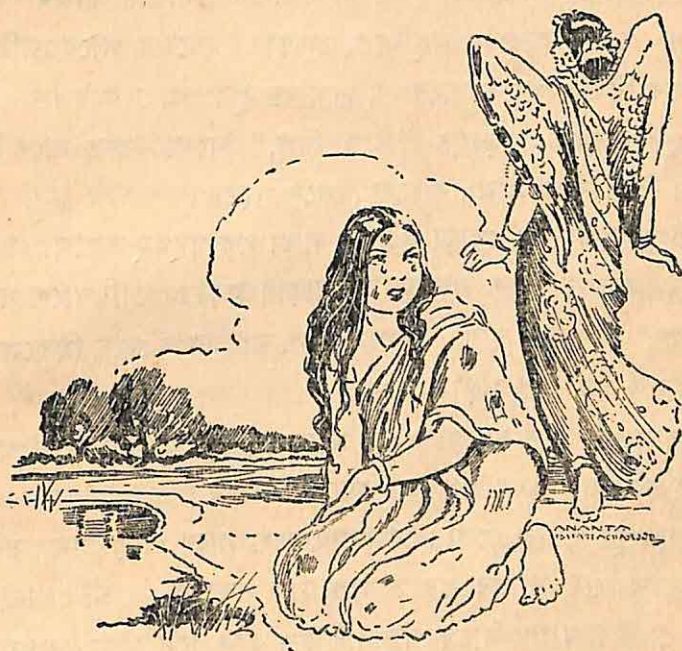
পরী বললো—এবার একটি বিড়াল আর দুটি টিক্‌টিকি চাই।

পোষা বিড়াল তো ঘরেই ছিল, আর দেয়াল থেকে দুটি টিকটিকি ধরে আনতে আর কতক্ষণ লাগে।

পরী বিড়ালটীকে করে দিল কোচ্‌ম্যান, আর টিক্‌টিকি দু'টিকে করে দিল সহিস।

ছ'ঘোড়ার জুড়ী গাড়ী তো হোল, এবার পরী বললো—চোখ বোঁজ !

পাঁশরাণী চোখ বুঁজলো, পরী পাঁশরাণীর গায়ে হাত বুলিয়ে দিল, বললো—এবার চোখ খোল !

পাঁশরাণী তো অবাক ঃ পরণে জরীর কাজ-করা রেশমী-শাড়ী, হাতে-পায়ে কোথাও এতটুকু ছায়ের দাগ নেই, মাথায় রাজনীগন্ধার সুবাস, পায়ে অভ্রের ঝিক্‌মিকে জুতো। নিজের পানে তাকিয়ে চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না, মনে হয় বুঝি স্বপ্ন দেখছে।

পরী তাকে গাড়ীতে উঠিয়ে দিল, বললো—রাত বারোটার আগে কিন্তু ফিরে এসো, নাহলে বিপদে পড়বে।

টগ্‌বগ্‌ টগ্‌বগ্‌ ঘোড়া ছুটলো, সারা পথ গম্‌গম্‌ করলো, রাজ-বাড়ীর দরজায় এসে থামলো ছ'ঘোড়ার জুড়ী। চারিপাশে সাড়া পড়লো, সিপাই-পাহারা সেলাম দিল, সবাইকার চোখ ফিরলো—কে যায় ? কাদের বাড়ীর মেয়ে ?

পাঁশরাণী এসে বসলো সভার মাঝে। সভা আলো হয়ে গেল। সবাই বললো—এমন রূপ তো কখনো দেখিনি !

রাজপুত্র সভায় এলো। মেয়েদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। সবাই নিজেদের গুণ জাহির করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো,—কেউ শোনালো গান, কেউ দেখালো নাচ। পাঁশরাণী চুপ করে বসে রইল একপাশে।

সবার শেষে রাজপুত্র এগিয়ে এলো পাঁশরাণীর কাছে, বললো—কই, তুমি তো গান গাইলে না, তুমি তো নাচ নাচলে না, তোমার নাম কি কন্যে ? কোথায় তোমার ঘর ?

ঢং করে একটা ঘন্টা পড়লো।

পাঁশরাণী ঘড়ির পানে তাকিয়েই দেখে বারোটা বাজতে সুরু

করেছে, পরীর নিষেধ মনে পড়ে, বললো—আরেকদিন এসে সব বলবো রাজকুমার, এখন চললুম—

বারোটা ঘন্টা বেজে যাবার আগেই পাঁশরাণী ছুটলো ফটকের দিকে।

ফটকটি পার হয়ে গাড়ীতে উঠেছে-এমন সময় বারোটা বাজা শেষ হোল। নিমেষের মধ্যে কোথায় গেল গাড়ী-ঘোড়া, কোথায় বা গেল বেশ-ভূষা,—কর্পূরের মত উবে গেল সব কিছু, ছেঁড়া কাপড়-পরা পাঁশরাণী দাঁড়িয়ে রইল পথের উপর।

তারপর হাঁটতে হাঁটতে অনেক রাতে পাঁশরাণী বাড়ী ফিরলো।

সৎমা আর সৎতাতো বোনেরা তখনও ফেরেনি। ফিরে এসে তারা পাঁশরাণীর কাছে গল্প করলো—এক যে মেয়ে এসেছিল, কোন্ দেশের কোন্ রাজকন্যাই হবে—ছ' ঘোড়ার জুড়ী, পরণে রেশমী শাড়ী, পায়ে অভ্রের জুতো, রূপে যেন পরী।

পাঁশরাণী মুখ বুঁজে শোনে।

ওদিকে তাড়াতাড়ি ছুটে পালাবার সময় একপাটি অভ্রের জুতো পাঁশরাণীর পা থেকে খুলে পড়েছিল। জুতো পরার অভ্যাস তো নেই, অতো সে বুঝতে পারে নি, আর বুঝতে পারলেও তখন বারোটা বাজার ভয়!

রাজপুত্র তো থ'। নাম জিজ্ঞাসা করতেই মেয়েটি চলে গেল, একপাটি জুতো রইল পড়ে, তা'ও নিতে এলো না। রাজপুত্র লোক পাঠালেন—পাড়ায় পাড়ায়, গাঁয়ে গাঁয়ে, নগরে নগরে—কার এ জুতো? কোন্ মেয়ের পায়ে ছিল?

ঘরে ঘরে মেয়েরা ছুটে আসে, বলে—আমারই বোধ হয়, দেখি? জুতো কিন্তু কারও পায়ে লাগে না,—কার বড় হয়, কার হয় ছোট।

রাজার লোক ঘোরে বাড়ী বাড়ী।

শেষে পাঁশরাণীর দরজাতেও জুতোওলা আসে, সৎতাতো দু'বোন ছুটে যায়, বলে—দেখি দেখি, আমাদের জুতো কিনা?

জুতো কিন্তু পায়ে লাগে না।

পাঁশরাণী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। জুতো দেখেই সে চিন্‌তে পারে, বলে—একবার পরে দেখি!

দু'বোন হাসে আর বলে—

ছেড়া কাপড়, গায়ে ছাই,
মাথায় জট—তেল নাই।
অমন রূপালী অভ্রের জুতো
—ওতো তোরই পায়ে মানাবে ভাই!

আমরা দেখে কত খুসি হবো,—

ছেঁড়া কাপড় গায়,
জরীর জুতো পায়,
রাজকুমারের বউ যায়—!

বোনেরা ঠাট্টা করে। পাঁশরাণী তাদের কথায় কান দেয় না, জুতো পায়ে দেয়।

মানায় চমৎকার!

সিপাই-সান্ত্রী অবাক হয়, বলে—এ জুতো তোমার?

পাঁশরাণী বলে—আমার!

—তাহলে চলো রাজকুমারের কাছে—

—কিন্তু এই ছেঁড়া ময়লা কাপড়ে যাই কেমন করে?

—স্নান কর, কাপড় বদলে নাও—

—কাপড় তো আর নেই?

—তাহলে ?

পাঁশরাণীর চোখে জল আসে।

রাজবাড়ীর লোকেরা তো অবাক—যার একখানা আস্ত কাপড় নেই, তার এই জুতো !

টপ্ টপ্ করে চোখের জল পড়ে মাটিতে, সে জল শুকোবার আগেই পরী এসে দাঁড়ালো তার সামনে, বললো—

কাঁদিস্‌নে রে, কাঁদিস্‌নে,
চোখের জল ফেলিস্‌নে,
ঠিক করে দিই সাজ,
রাজরাণী হবি আজ—!

পরী পাঁশরাণী মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে, গায়ে হাত বুলিয়ে দিলে,—মাথার চুল হোল তেল চুকচুকে, ছেঁড়া কাপড় রেশমী হোল, জরীর ফুল ফুটে উঠলো সুতোর ফাঁকে ফাঁকে। পরী আরেক পাটি অভ্রের জুতো পরিয়ে দিল তার আরেক পায়ে। পাঁশরাণী এক নিমেষে ফুলরাণী হয়ে গেল, রজনীগন্ধার সুবাস ছড়িয়ে পড়লো সারা গায়ে।

পরী শিষ্ দিয়ে ডাকলো, দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো ছ'ঘোড়ার জুড়ী গাড়ী। পরী পাঁশরাণীর হাত ধরে উঠে বসলো সেই গাড়ীতে। সৎমা আর হিংসুটে বোনেরা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল।

ক'দিন পরে পাঁশরাণীর সঙ্গে রাজপুত্রের বিয়ে হয়ে গেল। কত নহবৎ বসলো, ঢাক ঢোল সানাই বাজলো, কত জম্‌জমাট, কত জাঁক্‌জমক। দেশসুদ্ধ লোক কত মণ্ডা-মিঠাই খেল। পাঁশরাণীর দুঃখ ঘুচলো।

আমার কথাটিও ফুরুলো—

সুদখোরের সাজা

এক ছিল ডোম। নাম তার লছমণ। বেচারা বড় গরীব। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি বসে বসে ঝুড়ি বুনতো আর ঝুড়ি বেচে দু'চার পয়সা যা পেত, কোন রকমে দিন কাটাতো।

এতো দুঃখের উপরেও বেচারার আর এক দুঃখ ছিল, লছমণের পিঠের উপর ছিল মস্ত এক কুঁজ। সেই কুঁজের ভারে বেচারা সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারতো না। চলাফেরা করতে পারতো না। তবু তাকে চলতে হোত, গরীব লোক 'না' বললে তা চলবে না, উপোস করে মরতে হবে।

একদিন কুঁজো লছমণ পাশের গাঁ থেকে ঝুড়ি বেচে ফিরছিল। একটু করে আসে আর পথের পাশে বসে খানিক জিরিয়ে নেয়। সন্ধ্যাবেলা নদীর কিনারায় এসে পৌঁছালো। বুড়ো বট গাছটার নিচে বসে খানিক জিরুচ্ছে, অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে চারিপাশে, এমন সময় লছমণের মনে হোল দূর থেকে কেমন যেন একটা জল-তরঙ্গের

সুর ভেসে আসছে, ঢেউয়ের তালে তালে কারা যেন গান গাইছে। লছমণ ভালো করে শুনলো, গানের বাণী ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠলো,—মিষ্টি সুরে জল কাঁপিয়ে কারা গাইছে :

সকাল সাঁজে
কাজ তো আছে
এখন খানিক গেয়ে নি—

লছমণও গান গাইতে পারতো, ঝুড়ি বুনতে বুনতে আপন মনে কতবার সে বাউলের সুর ধরেছে। সেও সুরে সুর মেলালো—

জোছ্না রাতে
মনের সাধে
নাচতে খানিক বাধা কি—

আর যায় কোথা, লছমণের গাওয়া শেষ হতে না হতেই, একদল পরী উঠে এলো নদীর জল থেকে,—লালপরী, নীলপরী, সবুজপরী, হল্‌দেপরী। লছমণের চারিপাশ ঘিরে তারা নাচতে সুরু করে দিলে। নাচের তালে তালে তারা গাইল :

লছমণ, লছমণ,
গান গাও হরদম,
নাচতেও বাধা নেই,
বাজনা তো সাধা নেই।

লছমণও সুর ধরলো—

পিঠে কুঁজ করি কি,
সোজা হতে পারিনি,
চলা ফেরা কষ্ট,
দুঃখের অদেষ্ট !

লছমণ পিঠে হাত বুলায়।

পরীরাও একে একে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দেয় আর বলে—

ভালো লোক তুমি বেশ,
সব দুঃখ আজ শেষ,
কুঁজ তুমি চলে যাও,
লছমণ, নাচো গাও!

লছমণের পিঠ হাল্কা হয়ে গেল, সোজা হয়ে সে দাঁড়ালো—কই, কুঁজ তো আর নেই! তার চিরদিনের কুঁজ—আজন্মের কুঁজ আজ হারিয়ে গেছে। অনন্দে সে নাচতে সুরু করে দিলে।

সকাল বেলা লছমণকে যে দেখে সে-ই অবাক। সারা গাঁ অবাক! কুঁজো লছমণ সোজা হয়ে গেছে। নানা কথা জিজ্ঞাসা করলো নানা জনে, কতজনে কত রংচং দিয়ে কত কথা বললো।

পাশের গাঁয়ে থাকতো মদনমোহন। অনেক ছিল তার পয়সা, একগুণ টাকা ধার দিয়ে দু'গুণ সে আদায় করে নিত সুদ। তারও পিঠে ছিল একটা কুঁজ। পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে একদিন সে এলো লছমণের কাছে, বললো—কি করে তোমার কুঁজটি সারলো বলত ভাই?

লছমণ বললো সব কথা।

মদন বললো—তুমি তো গান গেয়ে সারালে, কিন্তু আমি তো ভাই গাইতে জানি না।

লছমণ বললো—ওসব গান-টান কিছু নয়, তুমি শুধু দু'কলি মুখস্ত বলবে—'জোছ্না রাতে মনের সাধে নাচতে খানিক বাধা কি' —তাহলেই হোল।

মদন দু'কলি মুখস্ত করতে করতে সন্ধ্যাবেলা নদীর তীরে বুড়ো বটগাছটার নিচে এসে দাঁড়ালো—কখন্ পরীদের সুর শোনা যায়, কখন্ গান ভেসে আসে !

সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে এলো, ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকতে সুরু করলো, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মদনের পায়ে ব্যথা হয়ে গেল। মদন বসলো। আঁধার জমাট বাঁধলো চারিপাশে, ভয়ে মন ছম্ ছম্ করতে লাগলো, কেমন করে বাড়ী ফিরবে তাই হোল মদনের ভাবনা। তবু মদন বসে রইল, একবার যখন এসেছে, শেষ অবধি না দেখে যাবে না।

বসে বসে দু'চোখে যখন ঘুম জড়িয়ে আসছে এমন সময় জলতরঙ্গের সুর উঠলো—

সকাল সাঁঝে
কাজ তো আছে
এখন খানিক গেয়ে নি—

রাগে মদনের মাথার মধ্যে রি-রি করে উঠলো, এতক্ষণে ওদের গান গাওয়ার সময় হোল! কান ঠিক রেখেও গানটা সে ভালোমত বুঝতে পারলো না, আরো রাগ চড়ে গেল, মুখ ভেংচে বললো—

গান গেয়ে তো কিনলে মাথা,
কিচির মিচির চামচিকি—

—কে কে ? কে আমাদের তাল কাটলো ? কে আমাদের গাল দিল ?

লালপরী, নীলপরী, সবুজপরী, হল্‌দেপরী—পরীর দল জল থেকে উঠে এলো মদনমোহনের সামনে।

মদনকে কিছু আর বলতে হোল না, পরীর দল তাকে কিছু

বলতেও দিল না। মদনের পিঠে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে তারা নাচতে স্থুরু করে দিল, আর গান ধরলো—

মদনমোহন, মদনমোহন,
সুদের হিসাব যখন তখন,
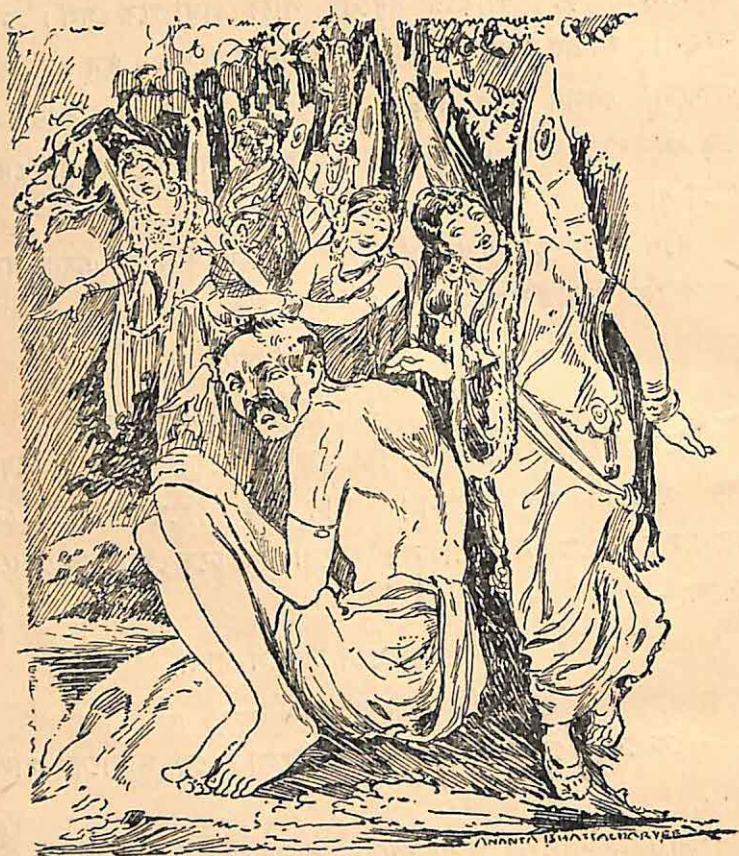
কড়া কাক তিল মাথা ভরা
জান্‌বি কি তুই গান করা!

স্থদ খা তুই বেশী করে
টাকা বাড়ুক পিঠের 'পরে !

পরীরা পিঠে হাত বুলায় আর গান গায় আর নাচে।

মদন ভয় পেয়ে যায়, পিঠটা কেমন যেন ভারী-ভারী বলে মনে হয়। পিঠে একবার হাত বুলিয়েই সে চমকে ওঠে—আর একটা কুঁজ উঠছে পুরানো কুঁজটির পাশে। আর সে বসে না, ভয়ে এক লাফে উঠে পড়েই দৌড় দেয় গাঁয়ের দিকে।

পিছনে পরীরা স্থর ধরলো ঃ

স্থদখোর মদ্না
ছুটে যায় দেখ্ না,
স্থদ যত কাড়ে—
কুঁজ তত বাড়ে !

মদন হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ী এসে ঢোকে। তাড়াতাড়ি আরসীর সামনে এসে দাঁড়ায় ঃ পিঠের উপর একটা কুঁজের জায়গায় পাশাপাশি ছুটো কুঁজ। মদনের চোখে জল এলো।

পাছে পরীদের কথামত কুঁজছুটো আরো বড় হয়ে ওঠে সেই ভয়ে সেই দিন থেকে মদন লোকের কাছে স্থদ নেওয়াই ছেড়ে দিলে।

রাজার বিচার

এক ছিল রাজা। সকাল সন্ধ্যা দরবারে বসেন,—মন্ত্রী-সেনাপতি, পাত্র-মিত্র, সিপাই-সান্ত্রী সভা জম্‌জমাট।

একদিন এক সভাসদ্ বললো—মহারাজ, গরীব-দুঃখীরা সুবিচার পায় না। ফটকের সিপাই-সান্ত্রীগুলোকে পাশ কাটিয়ে তারা আসতে পারে না ভিতরে।

বটে! রাজা বললেন—মন্ত্রী, এর তো একটা বিহিত করতে হয়!

মন্ত্রী পাকা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললো—তাইতো মহারাজ!

রাজা বললেন—আজ থেকে তাহলে ফটকে আর সিপাই রাখার দরকার নেই, যার খুসি সেই আসতে পারবে।

মন্ত্রী বললো—তা কি হয় মহারাজ? যদি তাদের মধ্যে কোন গুপ্ত শত্রু থাকে তাহলে তাকে ঢুকতে দেওয়া ঠিক হবে কি?

রাজপণ্ডিত বললেন—তাহলে ন্যায় বিচার হবে না? গরীব সুবিচার পাবে না?

সভাসদেরা মাথা নাড়লো—বটেই তো, তাহলে ন্যায় বিচার হবে না? গরীব সুবিচার পাবে না?

রাজা বললেন—মন্ত্রীমশাই, একটা উপায় ঠিক করুন, বিচারও হবে অথচ লোকটাও ভিতরে আসবে না।

মন্ত্রীমশাই সাদা দাড়ীতে হাত বুলোতে বুলোতে চিন্তা করতে লাগলেন—তাইত!

সভাসদেরাও মাথা ঘামাতে সুরু করলো—তাইত! তাইত!

হঠাৎ মন্ত্রী বললেন—এক কাজ করা চলে।

রাজা মুখ তুললেন।

মন্ত্রী বললেন—একটী বড় ঘণ্টা ঝুলিয়ে দেওয়া হোক এই সভায়, তার দড়ি ঝুলবে ফটকের বাইরে। যে সুবিচার চায় সে সেই দড়ি ধরে টান্‌বে আর এখানে ঘণ্টা বাজবে। ঘণ্টা শুনলেই আমরা তোরণে গিয়ে দাঁড়াবো, মহারাজ সেখানেই বিচার করে দেবেন।

রাজামশাই বললেন—বেশ কথা, বেশ!

রাজামশাই তখনি হুকুম দিলেন—ঘণ্টা ঝুলিয়ে দাও!

ঘণ্টা ঝুলিয়ে দেওয়া হোল, দড়িও ঝুললো।

কতদিন গেল, কত রাত গেল, দড়ি ধরে কেউ আর টানে না, ঘণ্টাও বাজে না।

ক্রমে দড়ি জীর্ণ হয়ে গেল, শণের দড়ি, কোথাও-কোথাও ছিঁড়ে ছিঁড়ে ঝুলে পড়লো। এক সান্ত্রীর হঠাৎ কি খেয়াল হোল, দড়িটা ছিঁড়ে যায় দেখে একটা খড়ের দড়ি পাকিয়ে জড়িয়ে দিল তার সঙ্গে।

একদিন সকালে কোথা থেকে একটী ঘোড়া এসে সেই খড় টেনে খেতে সুরু করে দিলে। ঘোড়াটা এক একবার খড়ের গোছায় টান দেয় আর রাজদরবারে ঘণ্টা বেজে ওঠে—ঢং ঢং ঢং।

কে? কে?—চারি পাশে সাড়া উঠলো।

রাজা উঠলেন, মন্ত্রী উঠলেন, সভাসদরাও উঠে দাঁড়ালো।

সবাই এল প্রাসাদ তোরণে। কিন্তু কই? কোথাও তো কেউ নেই? শুধু একটা ঘোড়া দড়ির খড় চিবুচ্ছে।

রাজা বললেন—তাইত!

মন্ত্রী বললেন—তাইত!

পারিষদরা বললো—তাইত!

রাজা বললেন—কি বিচার করি মন্ত্রী, ঘোড়াতো কথা কয় না? মন্ত্রী বললেন—তাইত মহারাজ, ঘোড়াতো কথা কয় না!

ঘোড়ার কোন দিকে খেয়াল নেই, দিব্যি আরামে সে তখন দড়ির খড় চিবুচ্ছে।

রাজা বললেন—ঘোড়াটা অনেকদিন খেতে পায়নি বলে মনে হচ্ছে।

মন্ত্রী বললেন—সেই জন্যই বোধ হয় অতো রোগা।

রাজা বললেন—কার ঘোড়া, তাকে ডাক—

পেয়াদা ছুটলো যার ঘোড়া তাকে খুঁজতে।

রাজা মশাই বলেছিলেন ডেকে আনতে—পুলিশ-পেয়াদা তাকে বেঁধে আনলো।

রাজা বললেন—তোমার ঘোড়াকে খেতে দাও না, কেন, বাপু?

—হুজুর, বুড়ো হয়ে গেছে, আর তো গাড়ী টানতে পারে না তাই ছেড়ে দিয়েছি। সারাদিন ঘাটে-মাঠে চরে খায়।

মন্ত্রী বললেন—খায় মানে? খেতে পেলে কখনও এমনি চেহারা হয়?

—হুজুর, আমি গরীব লোক, ঘোড়াটাকে বসিয়ে খাওয়াবার মত পয়সা আমার কোথা ?

মন্ত্রী বললেন—বটে, তুমি বুড়ো হলে তোমার ছেলেমেয়ে তোমাকে খাওয়াবে না ?

—হুজুর, আমি মানুষ আর ও জানোয়ার।

মন্ত্রী বললেন,—উঁহু, ও কথা শুনবো না, ভগবানের আইনে মানুষ আর জানোয়ারে কোন তফাৎ নেই।

—হুজুর, আমি গরীব লোক।

মন্ত্রী বললেন—আইনে গরীব বড়লোক বলে কিছু নেই, সবাই সমান।

—হুজুর !

রাজা বললেন—চুপ কর, কোন কথা আর শুনবো না। ঐ ঘোড়া এক সময় তোমার অনেক কাজ করেছে, আজ বুড়ো হয়ে গেছে বলে তাকে ছেড়ে দেওয়া চলবে না। যতদিন ওই ঘোড়া বাঁচবে ততদিন তাকে খাওয়াতে হবে। এর অন্যথা হলে তোমাকে সহজে ছাড়বো না। ঘোড়াকে আর পথে ছেড়ে দেওয়া চলবে না।

—যে আদেশ মহারাজ !—ঘোড়ার মালিক ঘোড়া নিয়ে বাড়ী ফিরলো।

রাজা বললেন—বিচার ঠিক হলো তো, মন্ত্রী ?

মন্ত্রী বললেন—খুব ঠিক, মহারাজ !

পারিষদরা বললো—খুব ঠিক ! খুব ঠিক !

রাজা বললেন—আমার আদেশ সহরে ঘোষণা কর— !

কোটাল নগরময় ঢোল পিটিয়ে দিল ঃ এ রাজ্যে কোন পোষা জানোয়ার বুড়ো হলে পথে-ঘাটে ছেড়ে দেওয়া চলবে না, যথারীতি খাওয়াতে হবে যতদিন না মরে।

আজ অবধি সে দেশে সেই নিয়মই চলে আসছে।
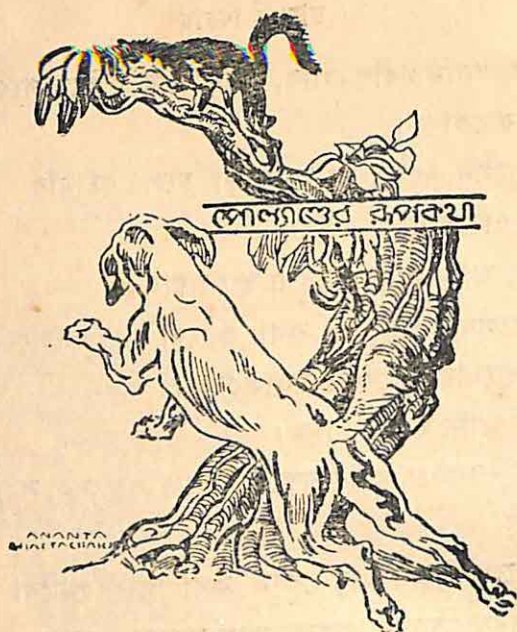
কুকুর-বিড়াল-ইঁদুর

অনেক—অনেক দিন আগের কথা। জানোয়ারদের এক রাজ্যে থাকতো এক কুকুর। অনেক ছিল তার জায়গা-জমি, খেত-খামার, জমিদারী। একদিন তার খেয়াল হোল তীর্থ করতে বেরুবে। জমিদারী দেখা-শুনা করতো এক বিড়াল, কুকুর তার হাতে সব ভার দিয়ে বেরিয়ে পড়লো, বলে গেল—সব ঠিকমত দেখা-শুনা করবে, আমি ক'দিনের মধ্যেই ঘুরে আস্‌ছি—

কুকুর তো চলে গেল। বিড়াল ভাবলো ঃ তাইতো, এখানে চাকরী নিয়ে অবধি সে একদিনও ছুটি পায়নি, এই সময় দিন কতকের জন্য দেশ থেকে ঘুরে এলে মন্দ হয় না। এক ইঁদুর ছিল দারোয়ান, তাকে ডেকে বিড়াল বললো—তুই সব দেখা-শুনা কর, আমি ক'দিন দেশ থেকে একবার ঘুরে আসি।

ইঁদুরের উপর সব কাজের ভার দিয়ে বিড়াল চলে গেল দেশে।

ইঁদুরের কাজের আর শেষ নেই। তার উপর আবার এই নতুন কাজ জুটলো, খেটে খেটে সে আর পারে না। সবাইকারই ছুটি আছে, আর তার ছুটি নেই? শেষে সে ঠিক করলো দিনকতক কেবলই পড়ে ঘুমুবে। ইঁদুর পড়ে ঘুমায় আর যত রাজ্যের পাখী এসে খেতের ফসল খেয়ে যায়—কেউ তাড়ায় না, কেউ দেখে না। কুকুর ফিরে এসে দেখে ঃ খেত আছে, ফসল নেই। বাড়ীতে বড় বড় আগাছা জন্মেছে, বাড়ী জঙ্গল হয়ে গেছে। কুকুর তো রেগেই আগুন, বিড়াল কোথায় গেল? বিড়াল দেশ থেকে ফিরতেই কুকুর গর্জন করে উঠলো—আমার খেত-খামার বাড়ী-ঘরের এই অবস্থা হোল কেন?

বিড়াল ছুটলো ইঁদুরের কাছে, তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বললো —খেত-খামার বাড়ী-ঘরের এই অবস্থা হোল কেন?

ইঁদুর সব দেখে-শুনে ভয়ে এক দৌড় দিল। বিড়াল তাড়া করলো তার পিছু পিছু, কিন্তু শেষ অবধি তাকে ধরতে পারলো না, বললো —আচ্ছা, যেদিন ধরতে পারবো টুঁটি ছিঁড়ে দোব।

সব শুনে কুকুর বিড়ালকে বললো—ওসব কিছুই আমি শুনবো না, শুনতে চাই না। তুমি কেন কাজে ফাঁকি দিয়েছ?

কুকুর লাফিয়ে পড়লো বিড়ালের ঘাড়ে। বিড়াল চম্‌কে উঠলো, তার পরেই দৌড় দিল বনের দিকে। কিন্তু কুকুরের সঙ্গে ছুটে পারবে কেন? শেষ অবধি বিড়াল এক গাছে উঠে বসে রইল। কুকুর বললো —আচ্ছা, নেমে এসো, যেদিন ধরতে পারবো টুঁটি ছিঁড়ে দোব।

সেইদিন থেকে কুকুর-বিড়াল-ইঁদুরে শত্রুতা সুরু হোল। কুকুর বিড়াল দেখলেই তাড়া করে, আর বিড়াল তাড়া করে ইঁদুরকে,— কেউ কাউকে ধরতে পারলেই কামড়ে টুঁটি ছিঁড়ে দেয়।

খরগোসের বুদ্ধি

অনেক—অনেকদিন আগের কথা।

জাপানের কাছেই ছিল আর একটী দ্বীপ। ছোট্ট দ্বীপ। মানুষের বসতি সেখানে ছিল না, জানোয়ারও ছিল না। কি ভাবে কে জানে, একটা বাচ্চা খরগোস সেখানে এসে পড়েছিল। ছোট্ট প্রাণী। সাদা ধপ্‌ধপে তুলোর মত নরম দেহ। সারা দ্বীপময় ছুটোছুটি লাফালাফি করে বেড়ায়। কোথাও কোন সঙ্গী নেই, চারিদিকে শুধু জল আর জল—সাগরের নীল জল। জলের ওপারে আকাশের গায় ফুজিয়ামা পাহাড় মাথা উঁচু করে আছে। বাচ্চা খরগোস সেই পাহাড়ের পানে তাকিয়ে থাকে আর ভাবে—কোন রকমে যদি একবার ওপারে যেতে পারি!

কিন্তু এতো জল, ডিঙ্গিয়ে যায় কেমন করে? বাচ্চা খরগোস দিনরাত জলের ধারে বসে বসে ভাবে।

একদিন যায়, দুদিন যায়, তিনদিন যায়,—দিনের পর দিন কেটে যায়। ওপারে যাবার কোন সুবিধাই খরগোসের হয় না। জলের

উপর মাঝে মাঝে শুধু ভেসে ওঠে কুমীরের মাথা। খরগোস দেখে আর ভাবে, ভাবে আর দেখে।

একদিন সে আর থাকতে পারে না। বড্ড একা-একা মনে হয়। কুমীরগুলো জলের উপর ভেসে ওঠে, সে দেখে আর ভাবে, ভাবে আর দেখে।

আবার সুরু হোল খরগোসের ভাবনা। সেদিনই সে মনে মনে স্থির করে বসলো—ওই কুমীরের পিঠে চড়েই সে সাগর পার হবে,—যেমন করেই হোক ওই কুমীরের পিঠেই সে চড়বে!

একদিন সাগরের ধারে এসে খরগোস ডাকলো—ও কুমীর মশাই, কুমীর মশাই!

এক কুমীর তার ডাক শুনতে পেল, ভেসে এলো কাছে, বিরাট হাঁ করে বললো—কি?
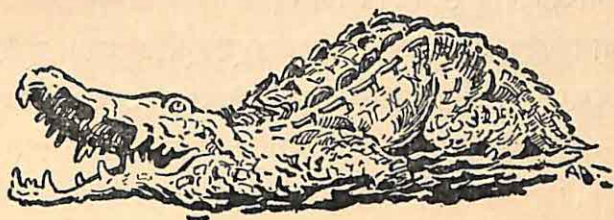
কুমীরের দাঁতের সারির পানে তাকিয়ে খরগোসের ভয় হোল। তবু সে বললো—আচ্ছা, এই সাগরের জলে তোমরা কতজন কুমীর আছ, বল ত?

—তাতো জানি না।

—জানি না মানে? তোমরা কতজন আছ গুনে দেখনি কখনও?

—না!

কিন্তু গুনে তো একবার দেখা দরকার। আমি শুনলাম এই ছোট্ট এক টুকরো দ্বীপে আমার যত খরগোস আছি, ওই অতবড় সাগরে কুমীর আছে তার চেয়ে অনেক কম।

—বাজে কথা—কুমীর বললো—খরগোস যতই থাক, কুমীর তার চেয়ে অনেক বেশী আছে।

—হতেই পারে না।

—একবার গুনে দেখলেই তো সব চুকে যায়, বাপু।

—গুনে দেখবে? বেশ। আমি এখনি সবাইকে ডেকে আনছি, গুনে দেখ!

কুমীর তখনই ছুটলো জলের নিচে। কিছুক্ষণের মধ্যে তার মা-বাবা ভাই-বোন ছেলে-মেয়ে বন্ধু-বান্ধব,—যে যেখানে ছিল সবাইকে ডেকে আনলো সেই দ্বীপের ধারে, খরগোসকে ডেকে বললো—নাও, এবার গুনে দেখ দিকি?

খরগোস তাকালো: চারিপাশে শুধুই কুমীর আর কুমীর—এব্ড়ো-খেব্ড়ো পিঠের সারি, যেন তার শেষ নেই। খরগোস বললো—এতো কুমীর গুনি কি করে? আমার তো চোখেরই ঠাহর হয় না!

কুমীর বললো—বেশ, আমিই গুনে দিচ্ছি।

—না না, তুমি গুনলে হবে কেন? সে কথা আমরা বিশ্বাস করবো কেন? আমরা গুনে দেখে নেব।

—বেশ, কি করতে হবে বল?

—তোমরা একটীর পর একটি পিছু-পিছু এক সারি হয়ে যাও, আমি তোমাদের পিঠের উপর একে একে গুনতে গুনতে চলে যাই। তোমাদেরও সুবিধা হবে।

—বেশ কথা !—কুমীর তখনই তার দলকে এক লম্বা সারিতে সাজিয়ে দিল,—এপার থেকে ওপার অবধি। তবু ধরলো না। যারা বেশী হোল—দাঁড়ালো তারা আরেক সারিতে পাশে পাশে।

খরগোসের বুকের ভিতর ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগলো, কিন্তু মুখে খুব সাহস দেখিয়ে প্রথম কুমীরের পিঠের উপর লাফিয়ে পড়লো, গুনলো—এক !
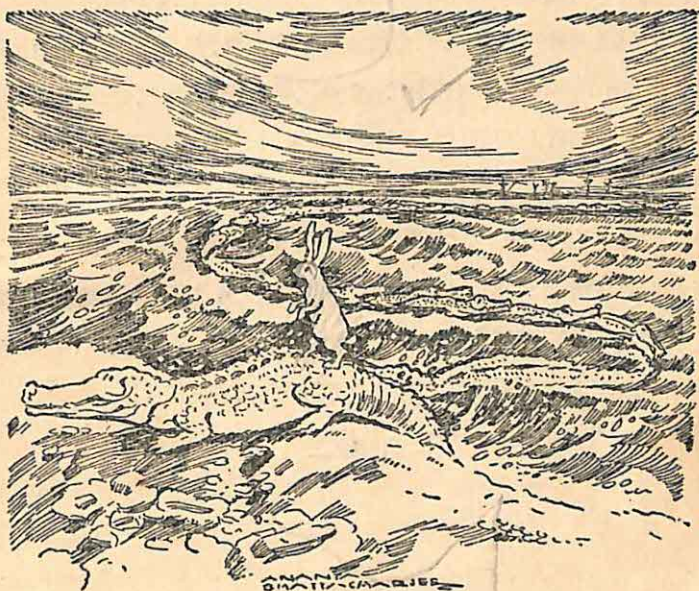
প্রথম কুমীরের লেজ পার হয়ে উঠলো দ্বিতীয় কুমীরের মাথায়, গুনলো—তুই !

তারপর তৃতীয়ের মাথায় গিয়ে গুনলো—তিন ?

খরগোস একে একে একটির পর একটি কুমীর পার হয় আর গুনে চলে—চার, পাঁচ, ছয় ইত্যাদি…

শুনতে শুনতে খরগোস ওপারে পৌঁছে গেল। জাপানের মাটিতে পা দিয়ে তার আনন্দ আর ধরে না, হাসতে হাসতে বললো—কুমীর মশাই, আমরা হেরে গেছি, আপনারাই বেশী।

কুমীর জিজ্ঞাসা করলো—তোমরা কতজন আছ ?

—আমরা সবে একজন মাত্র—সে আমি। ওই দ্বীপে একলা ছিলাম, বড় কষ্ট হচ্ছিল, তাই আপনাদের পিঠের উপর দিয়ে পুল তৈরী করে এপারে এলাম। ভাগ্যে আপনারা ছিলেন।

কুমীরের দল ক্ষণেক বোকার মত তাকিয়ে রইল খরগোসের মুখের পানে। অতটুকু খরগোসের কাছে বুদ্ধিতে হেরে গেল ভেবে বড় লজ্জা হোল। দলের সবাই তাড়াতাড়ি জলের নিচে মুখ লুকালো।

এদিকে খরগোস তো আর হেসে বাঁচে না। মনের আনন্দে ফিক্ ফিক্ করে এতো হাসি সে হাসলো, যে হাসির আবেগে তার উপরের ঠোঁটটাই ফেটে গেল। সে ঠোঁট আর জুড়লো না।

সেই থেকে সব খরগোসের উপরের ঠোঁট ফাটা।

—শেষ—